দেহ-যমুনা

শ্রী রাজকুমার রায়চৌধুরী

নাথ ব্রাদার্স
২৩-সি, ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ
২, গোবিন্দ সরকার লেন

দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত রাধেশ রায়

শ্রীচরণেষু—

এই লেখকের

আকাশ ও মৃত্তিকা

বন্ধনী

বসন্ত রজনী

মধুচক্র

শৃঙ্খল

পান্থনিবাস

কৃষ্ণা

দেহ-যমুনা

করুণা লিখিল ঃ

প্রিয়তমাসু,

এতদিন তোমায় চিঠি লেখবার সময় পাই নি। এদিকে আমার ভায়ের ছেলেটি মর-মর, ওদিকে সতীর কঠিন অসুখ। যম বোধ করি, সতীকে নিয়ে নন্দকে রেহাই দিলেন।

কিন্তু এমন অসুখও কখনও দেখিনি। ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ কিছু আনতেই তার দাদা বাকী রাখেন নি। কিন্তু কি যে রোগ কেউ ঠাহর করতেই পারলেন না। সাত দিনের জ্বরে সতী আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

সে কি মৃত্যু! সামনে না দেখলে বলা চলে না। বেচারী পনেরো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল,—তার পরে যে দেখেছে সেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে হতভাগী। আমরাই কি দুঃখ কম করেছি? তার মুখের পানে চাইতে পারি নি।

মৃত্যুর পরে তার সেই মুখের পানে যে চেয়েছে সেই বলেছে, ভাগ্যবতী বটে! সেই সুন্দর, হাসিমাখা মুখ। কোথাও এতটুকু ব্যথার চিহ্ন নেই। পৃথিবীর কোনো কলুষ যেন তাকে কখনও স্পর্শ করে নি। ঠিক যেন এই ঘুমুল।

স্বামী-সৌভাগ্যের গর্ব্ব আমরা করি। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, নিজেকে ভাগ্যবতী বলেই মনে করি। কিন্তু ওর প্রাণহীন দেহের পা-তলার দিকে দাঁড়িয়ে যেন নিজেকে অতি ছোটই মনে হ'ল।

মনে হ'ল, এমন মরণ ক্বচিৎ কারও হয়।

যত মেয়ে তখন এসে জুটেছিল, তাদের সকলেরই তো মুখের পানে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু ওর মতো মুখ তাদের কারও নয়। নেই রইল সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে কাঁকণ, দু-পায়ে আলতা,—তবু কত সুন্দর! ওর সতী নামটি সার্থক হয়েছে।

সতীর জন্যে দুঃখ করিনে ভাই, সে ভালোই গেছে।

প্রার্থনা করি, তার পুণ্যে তার স্বামী যেন তারই লোক পায়।

আজকে এই থাক। তোমার ছেলে-মেয়েদের আমার স্নেহ-চুম্বন দিও। তোমরা আমার ভালোবাসা জেনো। ইতি

তোমাদেরই বাল্যসাথী করুণা

ইহার উত্তরে অলকা লিখিল ঃ

প্রিয়তমাসু,

ভাই করুণা, সতী যে এমনি অকস্মাৎ আমাদের ফাঁকি দিয়ে যাবে, এই আশঙ্কাই আমি বরাবর করতাম। কিছু দিন আগে সে

আমাকে যে চিঠি দিয়েছিল তাতে লিখেছিল, প্রতিনিয়ত যেন তার স্বামী তাকে ডাকছে। বুঝি তার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে।

ওঁকে তো জান? [illegible] পড়ে-পড়ে যা-কিছু পান, যৌন-তত্ত্বের যাঁতিকলে ফেলে তারই মূল্য নির্ণয় করেন। এই কথা ওঁকে বলতেই হেসে বললেন, পুরুষের সঙ্গবিবর্জ্জিত বাইশ বছর বয়সের নারী এমনই স্বপ্ন দেখে।

দেখুক। কিন্তু যৌনতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে আমি ওর সতীত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে দোব না। গর্ব্ব যদি কোথাও আমাদের থাকে সে সতীত্বের এবং মাতৃত্বের। বিজ্ঞান এসে সেই দিক দিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে, তা আমরা সইতে পারব না।

আমাদের চেয়ে যৌনতত্ত্ব তো সতীকে বেশী চেনে না! তার সকল কথা, সকল কাজই যে মনে গাঁথা রয়েছে।

মনে পড়ে, তাদের বাড়ীর পেছনের বাগানটিতে কত খেলা-ঘরই না পেতেছি, কত পুতুলের বিয়েই না দিয়েছি, কত চড়ুই-ভাতিই না রেঁধেছি। দুষ্টুমির জন্যে বকুনিই কি কম খেয়েছি? হায়রে, সে চঞ্চলতা আজ কোথায়!

তবু তো আমাদের মধ্যে আজও কিছু চঞ্চলতা বেঁচে আছে,— সবটুকু নিঃশেষ হয়ে যায় নি। সেদিনও একটা কাচের গেলাস ভাঙ্গার জন্যে উনি হেসে বললেন, তোমার এখনও চঞ্চলতা গেল না। মনে-মনে বললাম, এ আর কি চঞ্চলতা তুমি দেখলে! ছেলে-বেলায় তো দেখনি।

চঞ্চলতা আজও কিছু আমাদের আছে। কিন্তু গেলবারের আগের বছর গিয়ে দেখলাম, ও যেন ওর সর্ব্বাঙ্গ থেকে সমস্ত চঞ্চলতা গুটিয়ে নিয়েছে। হাসলে, কথা কইলে, এঁর কথা নিয়ে কত রসিকতা করলে, তবু যেন কিছুতে ওর নাগাল পাওয়া গেল না।

বললাম, চল্ বাগানে যাই।

সে বাগান আর নেই ভাই। করবী গাছটি তেমনি ফুল দেয়, রজনীগন্ধার ঝাড় যেন আরও বেড়েছে, পূব কোণের নিমগাছটিকে বেষ্টন কোরে যে মাধবী লতাটি উঠেছিল সেটিও ঠিক তেমনি আছে। সবই সেই আগের মতো, তবু যেন সে বাগান নয়। আমাদের মত তেমন করে উল্লাসে-কলরোলে বাগান মাতাতে আর কে পারবে?

প্রথমটায় একটু বাধছিল বৈ কি। তবু শক্ত হয়েই প্রশ্ন করলাম। যে আতা গাছগুলির ঝোঁপের মধ্যে সকালবেলায় কাঁচা পেয়ারার শ্রাদ্ধ করতাম, তারই নীচে ব'সে ওকে বুকে টেনে নিয়ে বললাম, কি তোর ব্যথা আমায় বল্ সতী।

সতী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে,—ব্যথা? ব্যথা কিছু নেই তো।

আমি স্থির দৃষ্টিতে ওর পানে তাকিয়ে রইলাম। সে দৃষ্টির পানে একটুখানি চেয়ে ও বোধ করি কথাটা বুঝলে। চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীরে-ধীরে বললে, কষ্ট মাঝে-মাঝে হয় বৈ কি। ওঁর মুখ মনে করতে চেষ্টা করি। ঠিক মনে করতে পারি নে। ওঁর বাঁ চোখের তারার পাশে একটা তিল ছিল। তাই চোখ দুটি মনে পড়ে। আর কিছু না।

কি যেন একটু ভাববার চেষ্টা করলে। তার পর শ্রান্তভাবে বললে, দাদা বলেন, সমস্তক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকতে। দাদাকে তো তুমি জানো,—

—জানি। হরগৌরী দেখিনি, কিন্তু তোমার দাদাকে আর বৌদিকে দেখে অনুমান করতে পারি।

কি ওর মনে হচ্ছিল কে জানে, হঠাৎ বললে, তোর কোলে মাথা রেখে একটু শুই। শোব?

কোলের ওপর মাথাটি নিতেই কেঁদে ফেললাম। ওর ছোট-ছোট ছাঁটা কোঁকড়া চুলের ওপর গালটি রেখে কতক্ষণ কাঁদলাম জানিনা। নিজেকে ওর সামনে আর যেন শান্ত রাখতে পারছিলাম না।

ও কিন্তু কাঁদলে না, কিচ্ছু না,—শুধু দূরের কাঁঠালে-চাঁপা গাছটির পানে স্থির হয়ে চেয়ে রইল।

তার পরে বলতে লাগল, দিন-রাত্তির কাজ নিয়েই তো ব্যস্ত থাকি। তবু সব সময়ে কি তাই পারা যায়? মানুষ তো,—যন্ত্র তো আর নই।

সতী শ্রান্তভাবে একটু হাসলে।

বললে, রাত্রে ওঁর অস্পষ্ট মুখখানি ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ি। দিনের পরিশ্রমে একটুতেই ঘুমিয়ে যাই, ভালো করে ভাববার, ধ্যান করবারই বা সময় পাই কৈ?

অনেকক্ষণ পরে বললে, এই দেহটাকে নিয়ে আর পারি নে অলকা। এর পরমায়ু যে কবে শেষ হবে কে জানে!

এমন সময় ওর বৌদি তাঁর ছোট বাচ্ছাটিকে নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে উপস্থিত।

বললেন, ওমা, তুই এখানে ব'সে রয়েছিস্? তোর মটরু তো বাড়ী তোলপাড় করে তুলল। কি ছেলেই তৈরী করেছিস সতী!

তোলপাড় করার ছেলে বটে! ভারী সুন্দর ছেলেটি, না?

সতী শ্রান্তভাবে তাকে কোলের দিকে টেনে নিলে।

বৌদি আমার দিকে চোখ টিপে হাসলেন। ভাবটা, সতীর মনকে বাঁধবার এইটিই হ'ল সোনার শিকল।

মটরু আবোল-তাবোল অনেক কথা বকে চলল। কিন্তু সতীর মনটা কেমন্ উদাস হয়ে গিয়েছিল, তাই সে বিশেষ সাড়া দিলে না।

সেবারে এই পর্য্যন্ত। আর তো দেখা হয় নি। কিছুদিন আগে একখানা চিঠিতে লিখেছিল, কি তার নাকি অনেক কথা ছিল। সে কথা আর শোনা হ'ল না। চিঠিতে সব কথা লিখতে বলেছিলাম। লিখেছিল, চিঠিতে লেখার কথা নয়। কি কথা কে জানে?

সতীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরে বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। এঁকে বললাম। বললেন, বেশ তো।

আমি মাসখানেকের মধ্যেই যাব। ততদিন ভাই তোমাকে থাকতেই হবে।

আজকে এই থাক। দেখা হ'লে সব কথা হবে।

তুমি আমাদের ভালবাসা নাও। ছেলেমেয়েদের স্নেহ-চুম্বন দিও। ইতি

তোমাদেরই বাল্যসাথী অলকা

কিন্তু যে কথাটি দুজনের কেউ জানে না, যে কথাটি ওর কারও কাছে জানাইয়া যাওয়া হয় নাই, সে কথাটি এই :

সতীদের সংসার বড় নয়,—তার দাদা, বৌদি আর তাঁদের গুটি তিনেক ছেলে এবং সে নিজে।

বিধবা হওয়ার পর শ্বশুর বাড়ীর চিঠি প্রথম-প্রথম কয়েকখানি পাইত, তাও বৎসর খানেকের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীর সহিত সম্পর্কই লোপ পাইল।

দাদা তার অত্যন্ত গম্ভীর মানুষ। হাঁ এবং না ছাড়া কচিৎ কোনো কথা তিনি বলেন। অথচ এই বাড়ীর সকলেই বোঝে, তাঁর ছোট-বড় প্রত্যেক অনুশাসনটিই সকলের মানিয়া চলা চাই। কথা তাঁর স্বল্প, কিন্তু অমোঘ।

ছেলেদের বাদ দিলে বাকী যে ব্যক্তিটির সঙ্গে সতীকে কারবার করিতে হয়, তিনি বৌদি। তাঁর মাথার কাপড় সামলাইতে

গেলে আঁচল খসিয়া পড়ে এবং আঁচল সামলাইতে গিয়া মাথার কাপড় খুলিয়া যায়। একদিকে আপনার পরিধেয়, অপর দিকে ঘর-কন্নার কাজ—এই দুই দিকের আক্রমণে প্রায়ই তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সামনে যে ছেলেটি পড়ে তাহাকেই দুই ঘা কসিয়া দিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হন।

ফলে, বড় দুইটি ছেলে হাঁটিতে শিখিবার পর হইতে বাহিরের ঘরে বাপের কাছে আশ্রয় লইয়াছে। অতএব নিরুপায় হইবার কথা মটরুর। কিন্তু সে এখনও মার খাইবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং বৌদিরই বিপদ হইয়াছে বেশী,—রাগের সময় হাতের কাছে কাহাকেও পাওয়া যায় না।

মটরুর নিরাপদ হইবার আরও একটা কারণ আছে। বৌদি অকস্মাৎ একদিন আবিষ্কার করেন, সন্তান যার নাই সে নারী বাঁচিয়া থাকে কেমন করিয়া!

সে রাত্রে সতীর দিক দিয়া এই সমস্যাটি তিনি যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন ততই রক্ত মাথায় উঠিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। ভোরের দিকে মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার মটরু আছে যে!

পরের দিন মটরুকে তিনি সতীর হাতে দান করিলেন।

সতীর অগোচরে বুঝি কিসের ক্ষুধা তার মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছিল। মটরুকে পাওয়ার পর হইতে সেই ক্ষুধার আগুন যেন ইন্ধন পাইল। এতদিন সে হাসিত, খেলিত, উদয়াস্ত পরিশ্রম

করিত এবং অবসর সময়ে বৌদির দোষ ত্রুটী ধরিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিত। অতঃপর সে কাজকর্ম্ম চুলায় দিয়া মটরুকে লইয়া তেতালার ঘরে আশ্রয় লইল। নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাওয়ার উপক্রম।

তখন সতীর বয়স সতেরো।

শিশু যেমন নূতন খেলেনা পাইলে না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত সেটিকে নিষ্কৃতি দেয় না, তেমনি আদরে-আব্দারে, চুম্বনে-আলিঙ্গনে বিব্রত হইয়া মটরু না কাঁদিয়া ফেলা পর্য্যন্ত সতীর তৃপ্তি হয় না। তখন আবার তাকে শান্ত করিবার উপায় উদ্ভাবনে মন দেয়।

আশ্চর্য্য এই, মটরু কাঁদিলেও ভালো লাগে, হাসিলেও ভালো লাগে।

রাত্রে মটরু মায়ের কাছেই থাকে। পাশের ঘরে শুইয়া শুইয়া সতী প্রহর গোণে! ভোরের প্রত্যাশায় একবার ঘুমাইয়া, একবার জাগিয়া রাত্রি যাপন করে।

এমনি বিনিদ্র রাত্রে সে প্রথম টের পাইল, দিনের বেলায় বৌদি যতই দাদার ভয়ে-ভয়ে দূরে-দূরে থাকুন এবং দাদাও যতই গম্ভীর ভাবে বাহিরের ঘরে থাকুন, সমস্ত রাত্রি ইঁহারা কি-যে ফিস্‌ফাস্ কি-যে হাসাহাসি করেন, তার যেন আর শেষ নাই।

ভোরের দিকে ও-ঘরের দ্বার খোলার শব্দ পাওয়া মাত্র সতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে এবং জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত মটরুকে যে অবস্থায় পায় সেই অবস্থাতেই টানিয়া তুলিয়া এ ঘরে লইয়া আসে।

ব্যাপার দেখিয়া দাদা পাশ ফিরিয়া মুখ টিপিয়া হাসেন।

সতী মটরুর মুখ ধোয়াইয়া, চোখে কাজল দিয়া টিপটি কাটিয়া দেয়। নূতন পোষাক পরাইয়া দেয়। কিন্তু ছেলের চোখের কাজল তো? একবার কাঁদিলেই, বাস্। এক কাজলই সতীকে দশবার পরাইতে হয়। মটরুটা দুষ্টও কম নয়। সম্ভবতঃ, ইচ্ছা করিয়াই সে বারম্বার পোষাক নষ্ট করে। দিনের মধ্যে দশবার সতী তেতালা হইতে বৌদিকে জানাইয়া দেয়, এমন দুষ্ট ছেলে সে কখনও দেখে নাই।

এদিকে যখন ব্যাপার এইরূপ, তখন বাহিরের ঘরে আর একটা সমস্যার আবির্ভাব হইল।

দাদা দেখিলেন যে, বড় ছেলে দুটি মায়ের কাছ হইতে নিরাপদে থাকিলেও তাহাদের ভবিষ্যৎ বড় নিরাপদ নয়। লেখা পড়া বলিয়া যে কার্য্যটি প্রত্যেক ভদ্রসন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য, সে দিকে ইহাদের তেমন প্রীতি নাই। পক্ষান্তরে, তাম্রকূটের প্রতি একটা কৌতূহল ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার ভয়ে দিবারাত্রি অস্থির, বোন মুখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করে না। কিন্তু বয়স্ক যাহার সন্ধান পায় নাই, এই দুইটি শিশু, কেমন করিয়া না জানি, সেই দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে মোটেই ভয় করে না।

সুতরাং ও পাড়ার কৃষ্ণকিশোরকে মাসিক তিন টাকা বেতনে ছেলে দুটিকে পড়াইতে নিযুক্ত করা হইল।

কৃষ্ণকিশোর ছেলে ভালো, বয়সও অল্প। বছর দুই পূর্ব্বে ম্যাটিকুলেশন পাশ করিয়া গ্রামের মাইনর স্কুলে মাষ্টারী করিতেছে। শিশুকাল হইতেই এ বাড়ীতে তাহার অবাধ যাতায়াত।

কৃষ্ণকিশোর আসাতে ছেলে দুটির যত না হোক, বৌদির অশেষ সুবিধা হইল।

মটরুকে পাওয়ার পর হইতে সতী আর বড় নীচে নামে না। বৌদিকে একাই রান্নাবাড়া সমস্ত করিতে হয়।

তা, পরিশ্রম করিতে বৌদির আলস্য নাই, বরং বসিয়া থাকিতেই কষ্ট হয়। কিন্তু একা কোনো কাজ তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন না। ব্যস্তবাগীশ মানুষ, সর্ব্বদাই চরকার মতো ঘোরেন। ইহার মধ্যে তরকারীতে নুন দিয়াছেন কি না সব সময় মনে করিয়া উঠিতে পারেন না। একজন সহকারী তাঁর সর্ব্বদার জন্য হাতের কাছে চাই।

তবে কৃষ্ণকিশোর আসাতে তাঁহারও যে কাজ বাড়ে নাই তা নয়। পাঁচ জনকে খাওয়াইবার বদ অভ্যাসটি বৌদির কেমন মজ্জাগত হইয়া গেছে। যথাসময়ে নয়, যথা সময়ের অনেক পরে অকস্মাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া যায়, অমুকের খাওয়া হয় নাই। অমনি তার জন্য তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়।

হয়তো ন'টার সময় হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাই তো, সকাল

থেকে ছেলেটা পড়াইতেছে, এখনও তো তাহার জন্য চা পাঠানো হয় নাই। অমনি, ডাক কৃষ্ণকিশোরকে। বল্, চা খেতে আসুন।

কৃষ্ণকিশোর আসিল। বলিল, কি বৌদি?

—চা খেয়েছ?

কৃষ্ণকিশোর মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল। পরের বাড়ীর চা,—পাই নাই বলিতেও লজ্জা হয়, পাইয়াছিও বলা যায় না।

বৌদি রাগে গজগজ করিতে করিতে বলিলেন, এসেছ তো অনেকক্ষণ। একবার ভেতরে এসে খেয়ে গেলেই তো পারতে। আমার কি সব সময় সব খেয়াল থাকে? চেয়ে খেয়ে যেতে হয়।

তার পরে তাকের উপর হইতে চায়ের এবং চিনির কৌটা নামাইলেন। কি সর্ব্বনাশ! চায়ের কেৎলী কোথাও পাওয়া গেল না। বৌদির মাথা গরম হইয়া উঠিল:

অথচ চীৎকার করিবার উপায় নাই, পাছে এত বড় দুর্ঘটনা স্বামীর কর্ণগোচর হয়।

বৌদি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, এই একটু আগে তিনি এইখানে কেৎলী নামাইয়া রাখিয়াছিলেন। পাঁচ মিনিটের জন্য দোতালায় একবার গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, আর নাই!

এক বাটি চা পানের যে এত বাধা তাহা কৃষ্ণকিশোর জানিত না।

সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বৌদি হয়রাণ হইয়া পড়িলেন। তেতালার

উদ্দেশে হাঁক দিয়া শুধাইলেন, ও সতী, কেৎলীটা এইখানে রেখেছিলাম, জানিস্ ?

সতী তখন খাটের উপর শুইয়া মটরুকে বুকের উপর দাঁড় করাইয়া আদর করিতেছিল। বলিল, জানি।

বৌদি উল্লাসে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার মাথার কাপড় খুলিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিতে গিয়া আঁচল খসিয়া পড়িল। পরিধেয় বস্ত্র সামলাইতে সামলাইতে বৌদি বলিলেন, কোথায় রেখেছিস বল্ লক্ষ্মীটি। কৃষ্ণকিশোরকে চা দিতে পাচ্ছি না।

সতী তেতালা হইতে উত্তর দিল, আমার মাথার ওপর আছে, নিয়ে যাও।

অবাক কাণ্ড !

এমন সময় কৃষ্ণকিশোর আবিষ্কার করিল, কেৎলী উনানের পাশে আছে।

বাঁচা গেল। বৌদি উনানে কেৎলী চাপাইয়া বলিলেন, তাই তো বলি, কেৎলী যাবে কোথায় ? আমি তো তোমাদের বললাম, আমি উনোনের পাশেই রেখেছিলাম। তা, তোমরা তো কেউ খুঁজলে না !

খুঁজে নাই সত্য। কিন্তু উনানের পাশে কেৎলী রাখার কথাই বা বৌদি কখন বলিলেন, তাহাও কৃষ্ণকিশোর স্মরণ করিতে পারিল না।

অতঃপর কৃষ্ণকিশোরের ডাক আরও ঘন-ঘন পড়িতে লাগিল। হারাণো জিনিষ খুঁজিয়া দিতে যে কৃষ্ণকিশোর অদ্বিতীয়, এ ধারণা বৌদির মনে বদ্ধমূল হইল।

এমনি করিয়া বছর যায়।

মটরু হাঁটিতে শিখিল, কথা কহিতে শিখিল এবং আরও কিছু দিন পরে বাহিরের ঘরে পর্য্যন্ত হানা দিয়া দাদাদের বই ছিঁড়িয়া দিয়া আসিবার শক্তিও অর্জ্জন করিল।

অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে! তাহাকে সামলানো সতীর কাজ নয়।

নারীর কোলে চড়িয়া বেড়াইতে আর তাহার ভাল লাগে না, ঘরের মধ্যে বিচরণ করিতেও মন বসে না; তাহার বাহিরময় খেলিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা। খাওয়ার সময় ক্ষুধা পাইলে ভিতরে আসে, খাওয়া শেষ হইলেই বাহিরে পলাইয়া যায়। সতী ডাকিলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরের দিকে দৌড় দেয়।

এখন তাহার বাবার সঙ্গে ভাব।

শিশু-চরিত্রে ইহা কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। কিন্তু পরের ছেলের এই অকৃতজ্ঞতা সতীকে বিঁধিল। তাহারও কেমন একটা নিঃস্পৃহতা আসিল। মনে হইল, পরের ছেলেকে দিয়া মাতৃ-হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নাই। পরের

ছেলে কখনও আপন হয়? তবে আর বলে কেন, 'পরের ছেলে যায় আর বন পানে-পানে চায়'! সতী মটরুকে জোর করিয়া বুকে টানিয়া লইবার উৎসাহ বোধ করিল না। বরং নিজেই সরিয়া দাঁড়াইল।

আবার তাহার দিন কাটা ভার হইল। তেতালার বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার সে রান্নাঘরে হাতাবেড়ি ধরিল। সেখানে তখন কৃষ্ণকিশোরকে লইয়া বৌদি বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছেন! সতীর কাছে ইহাদের সঙ্গ মন্দ লাগিল না।

কৃষ্ণকিশোর বিধবা মায়ের ন্যাওটা ছেলে। ঘর-কন্নার কাজে মেয়েদের কান কাটিয়া দিতে পারে। ছেলে পড়ানোর চেয়ে বৌদির গৃহস্থালী গুছাইয়া দেওয়ার কাজেই তার আনন্দ বেশী। সুতরাং মিনিট দশেকের মধ্যে "নমোনমঃ" করিয়া ছেলে পড়ানো সারিয়া চা-পানের অছিলায় সেই যে ভিতরে আসে, দশটার আগে আর বাহির হয় না। রবিবারে তো এইখানেই খাওয়া-দাওয়া।

সতী দেখিল, কৃষ্ণকিশোরের মতো গল্প বলিতে কেউ পারে না। একবার সে গল্প ফাঁদিলে আর উঠিয়া আসা শক্ত।

গল্প জমে রবিবারের দুপুরে বৌদির ঘরে। বৌদির যে গল্প শোনার সখ বেশী, তা নয়। কিন্তু পাশে বসিয়া কেহ গল্প করিলে তাঁহার হাতের সূঁচ চলে ভালো। আগ্রহ সেইখানে।

তিনটি লোকের সভা। তার মধ্যে সভানেত্রী উদাসীন। সুতরাং কথা চলে আসলে সতী আর কৃষ্ণকিশোরের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে ?

প্রথমে কেউ জানিলও না। আত্মভোলা কথকটিও না, ভাবমুগ্ধ শ্রোত্রীটিও না। যখন জানিল, তখন অনেক দেরী হইয়া গেছে।

তখন রবিবারের দুপুরে কথকটির সভায় আসিতে সঙ্কোচে বাধে। মাঝে-মাঝে জোর করিয়া আসেও না। কিন্তু সে না আসিলে বৌদির কাঁথা সেলাই এগোয় না। ডাকের পর ডাকে শেষে আসিতে হয়। কিন্তু তেমন করিয়া গল্প আর জমে না। কথা-নির্ঝরিণীর উৎস-মুখে কোথায় যেন একটা পাথর আটকাইয়া গেছে,—স্রোত আর তেমন স্বচ্ছন্দগতিতে খেলে না।

বৌদি বলেন, তোমাদের ইস্কুলে সেই পণ্ডিতটি আছেন, যিনি চেয়ারে বসলেই হাঁ ক'রে ঘুমোন, আর ছেলেরা মুখের মধ্যে ছোট ছোট বিস্কুট ফেলে দেয় ?

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসঙ্গে কৃষ্ণকিশোরের বিশেষ একটা আগ্রহ ছিল। তবু শুধু একটু হাসিয়া বলিল,—আছেন।

বৌদি বলিলেন, পণ্ডিত মশায়ের গল্প তুই শুনিস নি, সতী। হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যায়। মাগো, মা, কি দুষ্টু ছেলে সব !

সতী কিন্তু চোখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। গল্প শুনিবার জন্য কৃষ্ণকিশোরকে কোনো জেদ করে না।

এমন করিয়া কয়দিন সভা চলে? বৌদির শত চেষ্টাতেও সভা আর টিঁকিল না। কৃষ্ণকিশোর সকাল বেলায় এক সময় আসিয়া মুখ নীচু করিয়া চা খাইয়া চলিয়া যায়। সতী তখন তেতালার ঘরে আহ্নিক করে।

*

স্থূক্ষ্ম জিনিষ বৌদির চোখে পড়ে না। মানুষের পানে যখন তিনি তাকান, তখন তার সমগ্র দেহের পানেই তাকান। কিন্তু সেদিন সতীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওকি চেহারা হয়েছে তোর সতী? মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে। তোর কি অসুখ হয়েছে?

এ প্রশ্নের পরে বৌদির পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিতে-উঠিতে বলিল, অসুখ আবার কি হবে? তোমার যেমন—

বহুদিন সতী আয়নায় মুখ দেখে নাই। নিজের ঘরে গিয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিল। বিছানায় উপুড় হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, আর মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কেবলই মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমায় তোমার কাছে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। আমি আর পারি না। এ মুখ আমি বাইরে কেমন ক'রে দেখাব?

কিন্তু সতীর ফাঁকা-ফাঁকা কথায় বৌদি শান্ত হইলেন না। যে স্বামীকে তিনি সর্ব্বক্ষণ ভয়ে-ভয়ে এড়াইয়া চলিতেন, তাঁহাকেই অসময়ে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দাদা ভিতরে আসিতেই বৌদি অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, বাইরের ঘরে তো দিন-রাত্তির বসে থাকো, এদিকে সতীর যে অসুখ, তার খবর রাখো?

বৌদির ক্রোধ দেখিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, সতীকে দু' মাস তো চোখেই দেখি নি। সে কোথায় থাকে?

বৌদি ঝরঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, তুমি তাঁকে দেখবে না, আমি তাকে দেখবো না, তাহলে সে কি ক'রে বাঁচে? তার আর কে আছে?

দাদা বলিলেন, কি হয়েছে? জ্বর?

এবারে বৌদির রাগ পড়িল সতীর উপর। ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, কি হয়েছে মুখপুড়ী কি তা কাউকে বলে! কত সাধ্য-সাধনা করলে তবে একবার নীচে এসে একমুঠো খেয়ে আমাকে কৃতার্থ করেন।

অপ্রস্তুত ভাবে দাদা তেতালায় চলিলেন।

বারান্দায় তাঁর পায়ের শব্দ পাইয়া সতী তাড়াতাড়ি আপাদ-মস্তক একখানা বিছানার চাদর মুড়ি দিল। অপরিসীম লজ্জায় তাহার মনে হইতেছিল, ধরণী যদি দ্বিধা হয়, সে তার মধ্যে মুখ লুকাইয়া বাঁচে।

দাদা প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে রে, সতী ?

লজ্জায়, দুঃখে তার তখন কান্না পাইতেছিল। কথা কহিবার শক্তি নাই। কোনো মতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কিছু হয় নাই।

—কিছু হয়নি তো অমন ক'রে পড়ে আছিস কেন ?

সতী কপালে হাত দিল।

দাদা বলিলেন, মাথা ধরেছে ? তাই বল্।

দাদার সুমুখে সতী জীবনে কথনো মিথ্যা কহে নাই। কিন্তু আজ কহিল।

দাদা নীচে নামিতে নামিতে বলিলেন, আচ্ছা আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তারপরে আসিলেন বৌদি। সতীর মাথাটি কোলে করিয়া তাহার মুখখানি নিজের দিকে ফিরাইতেই সতী তাঁর কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া কেবলই ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বলিল, তোমরা সবাই মিলে কেন আমার পিছনে এমন ক'রে লাগলে ? আমি বলছি, আমার কিছু হয় নি।

বৌদি জোর করিয়া আর একবার সতীর মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন।

যা ভাবিয়াছিলেন, তাই। ক্ষুধার্ত্ত দুটি চক্ষু কোটরের মধ্যে জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, গাল দুটি পাণ্ডুর। চোখ তুলিয়া সতী চাহিতে পারে না।

তার মাথাটি কোলে করিয়া মায়ের মত স্নেহময়ী বৌদি মৃত্যু ছাড়া তার জন্য অন্য কিছু কামনা করিতে পারিলেন না।

সত্যই তো, যে নারী পুরুষকে ভালবাসা দিবে না, পৃথিবীকে সন্তান দিবে না, তার মৃত্যুতে কার কি ক্ষতি ?

সে যাত্রা সতী কিন্তু মরিল না। শরতের গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। আবার আগের মতো সমস্তদিন ঘর-কন্নার কাজ করে, তবু যেন ঠিক আগের মানুষটি নয়। দেখিলে মনে হয়, পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধা, দেবতার বরে কোনো কৌশলে দেহের লাবণ্য আজও জিয়াইয়া রাখিয়াছে। বোঁটা-ছেঁড়া জলে-ভেজা গোলাপের দেহে যে লাবণ্য দেখা যায়, এ যেন তাই।

দেহ-যমুনায় দু'দিনের বান ডাকা শেষ হইল ; সঙ্গে সঙ্গে নদীর গতিপথও পরিবর্তিত হইল।

সতী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, আর রাত্রে নিভৃতে একান্ত গোপনে স্বামীর অস্পষ্ট মূর্তি ধ্যান করে।

পাশের ঘরে দাদাতে-বৌদিতে সমস্ত রাত্রি কি যে হাসাহাসি চলে, তাঁরাই জানেন।

ক্বচিৎ কখনো গভীর রাত্রে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিতে গিয়া সতী দেখে, বাহিরের মস্ত বড় উঠানে চাঁদের আলোয় দাদা এবং

বৌদি পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া একটা বড় বেঞ্চে ঠায় বসিয়া আছেন। সতীর দ্বার খোলার শব্দেও তাঁহাদের চৈতন্য ফিরে না।

সতী আর্ত্তস্বরে স্বামীকে ডাকিয়া বলে, আমায় এমন ক'রে একলা ফেলে কেন রাখো? তোমায় ছেড়ে একলা থাকা যায়?

কাঁদিয়া বলে, এমন কোরে মিথ্যে বাঁচার দায় থেকে কবে আমায় বাঁচাবে? আমি যে গেলাম।

সে প্রার্থনা তার স্বামী বোধ হয় শুনিয়াছিলেন। ইহারই বছর দুয়েক পরে সতী সম্ভবতঃ সতী-লোকেই চলিয়া গেল।

•

মন-পবন

অসাধারণ মেয়ে কিছু নয় ; যেমন আর পাঁচ জন, তেমনি। কিন্তু সে কথা লক্ষ্মীনারায়ণকে বোঝায় কে ?

সে বলে, সবুরে যে মেওয়া ফলে, সে কথা সত্যি।

বন্ধুরা সায় দেয়, তা বটে।

—দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না, ভাই। কোন্ থেঁদী-পেঁচী যে ঘাড়ে চাপবে সেই ভাবনায় ঘুম হ'ত না। যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমনিটি ভাই, মনের মতো।

লক্ষ্মীনারায়ণ বন্ধুদের কাছে নীলার রূপ দেবার চেষ্টা করে—

—কেমন জানিস ? যেন একটী ছোট্ট টিয়াপাখী আমার ডানার তলে রাত কাটাতে চায়।

বন্ধুরা টিপে-টিপে হাসে, কিন্তু মুখে বলে, তোর কপাল ভালো।

লক্ষ্মীনারায়ণ অশিক্ষিত নয়। তার একটা বিশিষ্ট আদর্শ আছে,—যদিচ সেটা তার নিজস্ব নয়,—এবং সমগ্রভাবে জীবনের একটা রূপও চোখের সামনে জেগেছে। আজ থেকে পঞ্চাশ

বৎসর পর্য্যন্ত সে কোন্ পথে চলবে, তারও ছক আঁকা এখনই শেষ ক'রে রেখেছে। সব চেয়ে বড় ক'রে চোখে পড়ে তার উগ্র নিষ্ঠা। মহাত্মার প্রসঙ্গে যে-কোনো লোকের সঙ্গে হাতাহাতি করা তার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, এবং তার মুদীর দোকান খোলা শুধু এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে যে, ইংরাজ-রাজত্বের ফলে দেশের যে সর্ব্বনাশ হচ্ছে তা'থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় সরকারী চাকুরী ছেড়ে ব্যবসা করা।

সুতরাং বিরুদ্ধ মনোভাববিশিষ্ট সংসারে প্রতিপদে নিষ্ঠার শুচিতা বাঁচাতে গেলে যে পরিশ্রম করতে হয় তাতে মেজাজ উগ্র হয়ে যাওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। হচ্ছিলও তাই, অকস্মাৎ—

তাহলে গোড়া থেকেই বলি:

বিয়ের ক'দিন পরেই--শ্বশুর বাড়ীতে।

তখনও দুজনের ভালো ক'রে পরিচয়ই হয় নি। ক্বচিৎ কখনও চোখে-চোখে দেখা, এক পলকের জন্যে। ঐ পর্য্যন্ত।

লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে একটা কবি-মন ছিল। নববধূর প্রতীক্ষায় পালঙ্কে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল, আজকের প্রথম সম্ভাষণটি ঠিক কেমন হ'লে মানাবে ভালো।

এমন সময় নীলা এলো,—মাথায় গুণ্ঠন। কিন্তু হাত দুটি

এমন আড়ষ্ট যে, মনে হচ্ছিল বসনখানি সে তার নিজের মনোমত ক'রে সামলে নিতে চায়, অথচ সামলাতে মানা।

যেন প্রতিমার সাজ,—মালাকর সাজিয়ে দিয়ে গেছে নিজের মনের মতো ক'রে, প্রতিমার এতে কোন হাত নেই।

বিপদ হয়েছে বেশী ঘোমটা নিয়ে। ছোট ছেলের মাথায় টুপি পরিয়ে দিলে সে যেমন অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্‌ করে, তেমনি হয়েছে তার।

লক্ষ্মীনারায়ণ কথা কইবে কি, ওর এই আড়ষ্ট মূর্ত্তির পানে চেয়ে মনে-মনে হেসেই বাঁচে না। এতটুকু মেয়ের আবার বিয়ে দেয়!

একমিনিট।

নীলা বেশ শান্ত ভাবে এসে তার পায়ের গোড়ায় টিপ্‌ ক'রে একটা প্রণাম করলে। ব্যস্‌।

গাঁয়ের কংগ্রেস কমিটীতে পাণ্ডাগিরি ক'রে লক্ষ্মীনারায়ণের মনে যে একটা অহমিকা এসেছিল, কিশোরীর এই প্রণামটুকু একেবারে সেইখানে পৌছুল। এক মিনিটে তার সমস্ত স্নেহ এই মেয়েটির পরে উদ্গত হয়ে উঠ্‌ল, মুচকি হেসে বললে, [illegible] কি হ'ল?

হাসি দেখে, নীলা যেন একটু সাহস পেলে। [illegible]লে, মা ব'লে দিয়েছে যে।

—তাই নাকি? তা বেশ। কিন্তু আমাকে তো একটা আশীর্ব্বাদ করতে হবে। কি আশীর্ব্বাদ করি বলতো?

আশীর্ব্বাদের কথায় নীলার হাসি আর থামে না। তার ঠাকমা আশীর্ব্বাদ করেন,—রাঙ্গা বর হোক। সেই কথাটি মনে পড়ল।

এমনি ক'রে দুটি অপরিচিত প্রিয়জনের মধ্যে পরিচয় সহজ হয়ে উঠল। নীলার মাথার ঘোমটা কখন খুলে গেল পোষাকি কাপড় আপনার অজ্ঞাতে কখন অভ্যাস মতো আঁট-সাঁট ক'রে বেঁধে নিল।

তারপরে আবোল-তাবোল বকুনি।

সে বকুনিতে মনোযোগ দেবার বয়স লক্ষ্মীনারায়ণের পার হয়ে গেছে। সে শুধু দুটি মুগ্ধ চোখ মেলে এই লঘুচ্ছন্দা ঝর্ণাটির পানে চেয়ে থাকে। মনে হয়, ও বুঝি মন্দাকিনী ধারা—স্বর্গ থেকে এই প্রথম তার পায়ের কাছটিতে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করলে।

—ওঃ হোঃ! তোমার সঙ্গে যে এখনো একটা ঝগড়াই করা হয় নি!

লক্ষ্মীনারায়ণ বিস্ফারিত চোখে ভয়ের ভাণ ক'রে বললে, কি অপরাধ করলাম?

অমনি নীলা হেসেই খুন। এই মানুষটা আচ্ছা হাসাতেও পারে যা হোক।

হাসতে-হাসতে শাসনের ভঙ্গিতে তর্জ্জনী নেড়ে বললে, ভয়ানক ঝগড়া। ঠান্‌দিরা অত কোরে বললে তুমি গাইলে না কেন?

—এই জন্যে ঝগড়া?

—হুঁ।—হাসি আর তার থামে না।

এরপরে তার দিদির ছেলেটির গল্প সুরু হ'ল। তার চেয়ে বছর তিনেকের বড়, কিন্তু এখনও হাফ্‌প্যাণ্ট পরে' রাস্তার লাট্টু খেলে। তবে পড়াশুনায় ভালো, বরাবর ফার্ষ্ট হয়। পনেরো বছর তো মোটে বয়স, এবারে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে।

—কিন্তু ভারি দুরন্ত। দিদির হাতে যা মারটা খায়, বাপ রে!

—তুমি মার খাও না?

—ধ্যেৎ। এতবড় মেয়ের গায়ে বুঝি কেউ হাত তোলে?

—তা বটে।

তারপরে বটুকের প্রসঙ্গ আরম্ভ হ'ল। বটুক কে, তা লক্ষ্মীনারায়ণের জানার কথা নয়। অনুমানে বুঝল, পাড়ারই একটা ছেলে, ওর পেয়ারা পাড়ার সাথী। এও সে অবগত হ'ল যে, এই ছেলেটি একদিন পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। এবং এই পড়ে-যাওয়া এমনি হাসির ব্যাপার যে, বটুকের তাতে আঘাত লেগেছিল কি না তা সঠিক জানা গেল না। তবে বোঝা গেল, আঘাত তেমন গুরুতর হয় নি। যা-ও একটু চোট লেগেছিল তা ছোটকাকার হাতে প্রহার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেরে যেতে দেরী হয় নি।

—ওঃ! ভারী ভুল হ'য়ে গেছে।

—আবার কি ভুল হ'ল?

এ কথার আর নীলা জবাব দিলে না। লক্ষ্মীনারায়ণের একখানি পা নিয়ে টিপ্‌তে ব'সে গেল।

—মা ব'লে দিয়েছেন ?

মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে নীলা জানালে, হ্যাঁ।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাধা দিলে না, চুপ ক'রে শুয়ে রইল। ধীরে ধীরে এই মেয়েটিকে কেন্দ্র ক'রে তার কল্পনা উর্দ্ধলোকে উঠতে লাগল।

সম্বিৎ ফিরে আসতেই দেখলে, ওর হাতখানি পায়ের ওপর ঠিকই আছে, কিন্তু চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে।

বললে, ঘুম পাচ্ছে ?

ঘুম সম্ভবত বেশীই এসেছিল। হাত দুটি ধরে টানতেই আস্তে-আস্তে ওর বুকের ওপর নেতিয়ে পড়ল। পলকের জন্যে দেহলতা অজ্ঞাতসারেই একটু আড়ষ্ট হ'ল। তারপরে শিশু যেমন মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমের ঘোরে এই বারো বছরের মেয়ের চোখ দুটি তেমনি সুখে নিমীল হ'ল। ভোরের বেলা ঘুম ভাঙলে লজ্জা একটু করবে বৈ কি।

কিন্তু এখন ?

তনু-দেহে শিহরণ একটুও জাগল কি ?

ও যেন নীল-পদ্মের কুঁড়ি,—দলগুলি মেলতে এখনও দেরী আছে। তবু অতি ক্ষীণ সুরভি মনকে একটুখানি যেন ছুঁয়ে যায়।

মোটের ওপর, কি যেন একটা পরিবর্তন আসবে এ যেন ও মনে-মনে বুঝতে পারলে। ঢল নামবার ঠিক আগে নদীর ক্ষীণ

দেহলতা যেমন আশা ও আশঙ্কায় দুলে ওঠে, তেমনি। নব মেঘের মায়া তৃণের বুকে-বুকে বর্ষার যে সম্ভাবনা জাগায়,—যাতে ক'রে সে থমকে যায়, উৎকর্ণ হয়ে আগতপ্রায় পরিপূর্ণতার পায়ের ধ্বনি শোনবার চেষ্টা করে, তবু বুকের গুরু গুরু থামে না,—সেও তো এই।

দিনের মধ্যে সহস্রবার, নিরালা পেলেই, আয়নাতে তার সিঁথির সিন্দুরটুকু দেখা চাই। শিশুকাল থেকে সহস্র সীমন্তে যে সিন্দুর দেখে এসেছে, তা যে এতবড় বিস্ময়ের বস্তু, তা সে এই প্রথম টের পেলে।

পেয়ারা গাছের ওপর থেকে বটুক ইসারায় পাকা পেয়ারার লোভ দেখায়। ইচ্ছে হয় ছুটে যায়, কিন্তু গতি যেন তার স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তার দিদির ছেলে যতীশ মাঝে-মাঝে ঝগড়া বাধাতে আসে। মাঝে-মাঝে হাতাহাতিও যে না হয়, তা নয়। কারণের তো অভাব ঘটে না, সব সময়েই বর্ত্তমান।

ইস্কুলে যাবার সময়ে তার ফাউণ্টেন পেনটি পাওয়া গেল না। পেনটি নীলার নেওয়া সত্যি এবং ধরাও ঠিক প'ড়তো। কিন্তু রাগের সঙ্গে যে আসে তার পায়ের শব্দ হয় না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্র সে বেমালুম সেটিকে লুকিয়ে ফেললে।

যতীশ এসেই বললে, আমার কলম নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছে। দাও আমার কলম।

নিতান্ত ভালোমানুষের মতো নীলা বললে, বাঃ রে বা! আমি নিয়েছি নাকি?

যতীশ কিন্তু এতে নিরস্ত হবার পাত্র নয়। সে একেবারে পূজনীয়া মাসীমার একখানা হাত ধ'রে দিলে এক ঝাঁকুনি। এর পরে হাতাহাতি বাধার পথ সুগম হ'য়ে গেল।

যতীশ বেটা ছেলে। ওর গায়ের জোরও বেশী,—সুতরাং চীৎকার ক'রতে লাগল নীলা। শেষটায় যতীশের মা এসে যতীশের কাণ চেপে ধরতেই যতীশ তাকে ছেড়ে দিলে।

—হতভাগা ছেলে, ইস্কুল যাওয়ার নাম নেই, মারামারি করতে ওস্তাদ।

—আমার ফাউণ্টেন পেন নিয়েছে যে!

দিদিকে দেখে নীলার সাহস বেড়ে গেল। কোমরে কাপড় জড়াতে-জড়াতে বললে, নিয়েছে ওর কলম! দেখেছ?

—হ্যাঁ দেখেছি।

দেখার কথাটা যতীশের মিথ্যে। কিন্তু রাগের মাথায় এ ছাড়া কোনো উত্তর ওর এল না।

—বেশ ক'রেছে, নিয়েছে। কলম নইলে ওর যেন ইস্কুলে যাওয়া হবে না!

মায়ের পক্ষপাতিত্বে যতীশ রেগে কেঁদে ফেললে,—বিয়ে ক'রে যেন নবাব হয়েছেন। দোব একদিন এমন এক ঘুঁসি—

যতীশ দুপ্-দাপ্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কিন্তু ঘুঁসির কথায় নীলা যে বিশেষ ভয় পেলে তা মনে হ'ল না।

দূর থেকে যতীশ তখন বলতে বলতে চলেছে,—বরকে রোজ চিঠি লিখতে হয়, নিজে কলম কেনো। আমারটিতে আর কোনো-দিন হাত দিয়েছ কি—

এ কথা ওপরের ঘরে দুই বোনেরই কাণে গেল। দিদি মুচ্কি হেসে বেরিয়ে গেলেন। নীলা বালিসে মুখ লুকিয়ে খুব খানিকটা হেসে নিলে। যতীশটা কি ছেলেমানুষ! ওর বুদ্ধি কোনো কালে হবে না।

যতীশ তখন রাস্তায় যেতে-যেতে ভাবছে,—খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে সে।

৫

আশ্চর্য্য এই যে, বটুক কিন্তু এখন যেন নীলাকে সমীহ করতে আরম্ভ করেছে। অথচ এরই সঙ্গে ওর একদিন বিয়ের কথা হ'ত। তখন—

কিন্তু তখনকার কথা এখন তুলে লাভ নেই।

এখনও বটুক কখনও কখনও জামরুল পেড়ে দেওয়ার লোভ দেখায়, কিন্তু অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে। মনে-মনে ভাবে, এখন সে আর আগের মতো ছুটে আসবে না।

ছুটে হয় তো যায়। কিন্তু বটুকের মনঃপূত হয় না। এই মেয়েটির মধ্যে সে তার আগেকার মানস-বধূকে খুঁজে পায় না। আগে আধখাওয়া পেয়ারা বাঁ হাত দিয়ে যার দিকে ফেলে দিত, এখন তারই জন্যে আগ্‌ডালের পেয়ারাটি কত কষ্টে পেড়ে এনে নিজের হাতে দিয়ে কৃতার্থ হয়।

তার কেবলই মনে হয়, এই মেয়েটির চোখে সে যেন ছোট হ'য়ে গেছে। তবু রাগ হয় না,—নিজের ওপরও না, ওর ওপরও না। আঁচল লুটিয়ে-লুটিয়ে ও যখন চ'লে যায় বটুক তখন করুণ নয়নে চেয়ে থাকে।

তখন যদি ও বলে,—বটুকদা, কাঁচা মিঠে আম নিয়ে আসতে পার? বটুক এক দৌড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে সেই রাখাল-গাছির বাগানের সব চেয়ে ভালো কাঁচামিঠে গাছের আম পেড়ে এনে দিতে পারে। কাঁটা-দেওয়া গাছ বেয়ে উঠতে বুক যদি ছিঁড়ে যায় তো যাবে।

রাগে যতীশ। বলে, দেখছিস ভাই, বিয়ে হয়েছে ব'লে আমাদের যেন গ্রাহ্যই করে না। তবু যদি ফার্ষ্ট বুকখানা শেষ ক'রতো!

বটুক বলে, হুঁ।

আমের আঁটিটা জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যতীশ বলে, —ওকে আমি দুটি চক্ষে দেখতে পারি না।

বটুক বলে, হুঁ।

—দাড়ুটা কেন যে ওর বিয়ে দিলে! না দিলে বেশ হ'ত, থাকতো থুবড়ো হয়ে ধিঙ্গী মেয়ে।

আবার বলে, একগাদা গয়না হয়েছে কি না, সেই গরমে মাটিতে আর পা পড়ে না।

ওরা যেন পিঠো-পিঠি। ওইটুকু মেয়ের গায়ে এক গা গয়না, আর এক বৎসর খোসামুদি ক'রেও ওর একটা রিষ্ট-ওয়াচ হ'ল না, এইটে ও সহ্য করতে পারে না।

যতীশ বলে,—ভারী হিংসুটে। সেদিন বললাম, দাও না মাসী, তোমার হেজ্‌লীন একটুখানি। মেয়ে একেবারে চাবিটা ঝম্ ক'রে পিঠে ফেলে চলে গেলেন।

যতীশ ওর চাবির রিং পিঠে ফেলে চ'লে যাওয়ার ভঙ্গী নকল ক'রে দেখায়।

বটুক হাসে, বলে,—বর বি-এ পাশ কি না তারই গরম।

যতীশ বলে, কিন্তু আমার মেশোমশাই ভাই খুব ভালো।

মেশো মশাইটির ওপর বটুকের, কেন জানিনে, রাগ আছে। বলে,—লোক ভালো, কিন্তু ভাই, একটু দেমাকে।

সে কথা যতীশ মানে না। বলে,—দূর, তুই জানিস নে। সেদিন চাইতে-না-চাইতে দামী ফাউণ্টেন পেনটা দিয়ে দিলে। ও হ'লে দিত?

এই ফাউণ্টেন পেনটি নিয়েই দুজনের ঝগড়া।

মোট কথা, যে-দুটি সঙ্গী নীলার ছিল, সেই দুটিই ওর প্রতি আর প্রসন্ন নয়।

এই মেয়েটির জন্যে মায়ের দুর্ভাবনার অন্ত নেই,—বকুনির ও কামাই নেই:

—বেহায়া মেয়ে দিন-রাত্তির লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন,—লজ্জাও করে না?

রান্নাঘরের কোণ থেকে নীলা ঝঙ্কার দিয়ে বললে,—কোথায় আবার লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ালাম! সমস্তক্ষণ তো ব'সে।

—আছ ওখানে ব'সে! একটু আগে পুকুরে সাঁতার কাটছিল কে?

রাগে কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে নীলা বললে—তাই ব'লে চান করতেও যেতে পাব না? পারব না আমি সমস্তক্ষণ তোমার পেছুনে পেছুনে ঘুরতে।

—তা কেন পারবে? তাহলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! দাঁড়াও, দাঁড়াও, শ্বশুর-বাড়ী তো যাও, ঠেলা বুঝবে সেইখানে। এখানে তো সুবিধা হ'ল না!

নীলা মুখ ভার ক'রে ব'সে রইল।

মা আবার বললেন,—বাবাঃ! আর পারি নে। শ্বশুর-বাড়ী পাঠাতে পারলে বাঁচি!

—তাই বাঁচো, তোমরাও বাঁচো, আমিও বাঁচি।—বলেই নীলা দুপ্-দাপ্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল।

মেয়ের কথা শুনে মা তো অবাক!

—ও ছোট বৌ, ও মেজ বৌ, শোনো, শোনো, মেয়ের কথা শোনো। কালকে বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে শ্বশুরবাড়ীর ওপর এত টান!

জামাইয়ের শান্ত, সৌম্য, প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি,—তার মিষ্টি কথা, মিষ্টি হাসি মায়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল। আনন্দে তাঁর দুটি চক্ষু ছল-ছল ক'রে উঠল। মনে মনে ভগবানের উদ্দেশে দম্পতীর জন্য কি যে প্রার্থনা জানালেন, তা আর কেউ জানল না।

শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ঠেলাই বুঝতে হ'ল।

একেবারে নতুন আবেষ্টনী। নীলা অবাক হ'য়ে সবারই মুখের পানে চেয়ে থাকে। এতগুলো লোক আসছে, যাচ্ছে, ব'সছে,—অথচ এদের কাউকে সে চেনে না, কখনো দেখেও নি—এর চেয়ে বিস্ময় আর কি আছে!

এদের বাড়ীও অন্য রকম। ওদের বাড়ীর গড়ন ঢিলা-ঢালা,—সামনে-পেছুনে অনেকটা জায়গা। বাড়ীটা অনেকখানি জায়গার ওপর কেমন যেন আলগাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর

এদের বাড়ী সমস্তটুকু জায়গা আঁকড়ে কেমন যেন বুক-চাপা হ'য়ে দাঁড়িয়ে।

ওদের বাড়ীতে হাল্‌কা হ'য়ে নেচে নেচে বেড়ানো চলে। এখানে কেবলই কোণে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে ইচ্ছে হয়। ওর ঘরটির তবুও দক্ষিণ খোলা, তাই রক্ষে। নইলে হাঁফিয়ে উঠতো। নীচে যখন ওর নিশ্বাস আটকে আসে, তখন চুপি-চুপি পালিয়ে এসে দক্ষিণের বড় জানালাটির পাশে বসে। গুটিকয়েক তেঁতুল গাছের ছায়ায় যেখানে পাড়ার ছেলেরা খেলা করে, ওখান থেকে সে জায়গাটি দেখা যায়।

ওই জানালাটির পাশে ব'সে যে ছেলেদের খেলা দেখতে পায় এইটুকুই নীলা ভাগ্য ব'লে মানে। এটুকুও যদি না পেতো!

তা বাড়ীর লোকেরা ভালো। নীলাকে একেবারে রাণী ক'রে রাখে। আদর যত্নের কোনো ত্রুটি নেই। তবুও—ওরই মধ্যে একটু যদি শাশুড়ী শাসন করেন, নীলার ছ'চোখ জলে ঝাপসা হ'য়ে আসে।

চটে বীণা। বছর সতেরো বয়স। গুটি তিনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে ক'দিন হ'ল বাপের বাড়ী এসেছে। সে এ সব আদিখ্যেতা দেখতে পারে না। মাকে ক্রমাগতই ধমকায়।

বলে,—না, চা ওপরে পাঠানো হবে না। তোমার রাণী-বৌ নীচে এসে চা টুকু খেয়ে যেতে পারে না?

মা হেসে বলেন,—তা দিলামই বা ওপরে চা পাঠিয়ে। তাতেও তো কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না!

—মহাভারত যে অশুদ্ধ হবে না, সে আমি জানি। কিন্তু দেবেই বা কেন ওপরে চা পাঠিয়ে? বৌ তো কুটুম নয়!

তর্কের তো কথা নয়। চল্লিশ বছরের মায়ের মন কি সতেরো বছরের মেয়ের বোঝে? মা চুপ ক'রেই রইলেন।

বীণা চা খেতে-খেতে মাকে উপদেশ দিতে লাগল। এবং তার শাশুড়ী এ সমস্ত ক্ষেত্রে কিরূপ মোক্ষম মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেন তাও জানিয়ে দিল।

ননদীকে নীলা বাঘের মত ভয় করে। প্রাণপণে সে বীণাকে খুসী রাখতে চেষ্টা করতে লাগলো। তবু হঠাৎ এমন আচমকা সে রেগে ওঠে যে নীলা ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—লোটন কাঁদছে, শুনতে পাচ্ছ না?

নীলা তাড়াতাড়ি উঠে লোটনকে কোলে ক'রে বাইরে নিয়ে এল। লোটন কিন্তু শান্ত ছেলে নয়। চোখ বুজে-বুজেই সে প্রথমে চীৎকার এবং তারপর হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে। তাকে সামলান নীলার কাজ নয়। নীলা তাকে কোলে ক'রে উঠোনে বেরিয়ে এল, চাবির গোছা ঝম ঝম ক'রে বাজালে, বাগানে পর্য্যন্ত ঘুরে এল। কিন্তু ছেলে সেই যে একঘেয়ে সুরে চোখ বন্ধ ক'রে কাঁদতে লাগল, আর চোখও মেলে না, কান্নাও বন্ধ করে না।

অতি ভয়ে ভয়ে নীলা এসে বললে,—থাকছে না কিছুতেই।

—থাকবে কি ক'রে? অমন লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়ালে ছেলে থাকে?

এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। আস্তে চলা বা শান্তভাবে কোনো কাজ করা তার স্বভাবের বাইরে।

লক্ষ্মীনারায়ণ দোকান ক'রতে ক'রতে দিনের মধ্যে সাতবার বাড়ীর ভিতর ছুটে আসে। কখনো নীলার সঙ্গে একটুখানি দেখা হয়, কখনো হয় না। এইটুকু মন্দ লাগে না। লক্ষ্মীনারায়ণের মনের সমস্তটুকু কথা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু এ যে ঠিক ছেলেখেলার লুকোচুরি নয়, তা বোঝবার মতো বয়সও তার হয়েছে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে ক'রে সে দোরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। দেখে, চারিদিকে ওর চোখ যেন ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মুখে বলছে, মা, সেই পাঁচসেরী বাটখারাটা পাচ্ছি নে যে!

বোঝে সবাই। তবু মা বলেন,—কি জানি কোথায় রেখেছিস বাপু। কোথায় যে কি রাখিস তার তো ঠিক নেই।

বীণা কিন্তু ছাড়ে না। বলে,—বৌকে বরং জিগ্যেস কর বড়দা, সে যদি রেখে থাকে,—বলা তো যায় না। কিন্তু আমি বলি বড়দা, বার বার বাটখারার খোঁজে বাড়ীর ভিতর আসার চেয়ে বৌকে বরং দোকানঘরেই নিয়ে যাও।

বীণার সঙ্গে কথায় পারার যো নেই। অপ্রস্তুত হ'য়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ পালাবার পথ পায় না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, খুব ফাজিল হয়েছিস!

লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থা দেখে বীণা মাঝে-মাঝে অবাক হ'য়ে ভাবে, এই বড়দা বিয়ে করতে চাইত না!

মা বলেন, তা এখন বিয়ে করেছে, বৌকে আদর-যত্ন করবে না?

বীণা ঘুমন্ত কোলের শিশুটিকে পিঠে ফেলে শুইয়ে দিতে গেল। দেখে, ঘরের মধ্যে নীলা লোটনের পাশে জড়-সড় হ'য়ে ব'সে আছে।

—ওখানে কি ক'রছ?

—লোটনকে ঘুম পাড়াচ্ছি ঠাকুরঝি।

দোলনার ওপর শিশুটিকে শুইয়ে দিয়ে বীণা বললে,—তা তো পাড়াচ্ছ। কিন্তু বড়দা যে দশবার এসে ফিরে গেল।

নীলার মাথা লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তার তখন এমন রাগ হচ্ছিল,—কেন এমন ক'রে বার বার আসে ও?

ওই তখুনি। পরের দিনই আবার সমস্ত মন লক্ষ্মীনারায়ণের পায়ের শব্দটুকুর জন্যে সারাক্ষণ একাগ্র হ'য়ে থাকে।

কিন্তু বীণাকে নিয়ে মুস্কিল দুজনেরই। দিনের বেলায় দেখা হওয়ার তো উপায়ই নেই। দেখা যা হয় রাত্রে।

তেরো বছরের তো মেয়ে, এখনও দেহের রেখায় তরঙ্গ জাগে

নি। কিন্তু ছুটোর এদিকে ঘুমোবার নাম করে না। শুধুই বলে,
—তারপর ?

দোকান নিয়ে খাটুনি তো বড় সোজা নয়। লক্ষ্মীনারায়ণ হাই তুলে বলে,—তারপরে সে-বাজিতে ওরা হেরে গেল। দিলাম একটা রেড্ সেট্।

তাস খেলার নীলা কিছুই বোঝে না। তবু মনোযোগের সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করে। স্বামীর ডান হাতের একটা আঙুল টানতে-টানতে বলে,—আর খেললে না ?

—না।

—আচ্ছা, তোমার যে কালকে কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল, কই গেলে না তো ?

—সোমবারে যাব।

নীলা ওর ডান হাতখানি জড়িয়ে ধরে বললে,—হ্যাঁ, তাই বই কি! দেবে তোমায় যেতে।

লক্ষ্মীনারায়ণ হেসে বললে,—আচ্ছা।

একটু পরে নীলা হেসে বললে,—আমি ত শ্রাবণ মাসে যাচ্ছি।

—কোথায় ?

একটু ইতস্ততঃ করে নীলা বললে,—বাপের বাড়ী।

—কে বললে ?

—মা মত দিয়েছেন যে।

লক্ষ্মীনারায়ণ একটু হেসে বললে,—এরই মধ্যে যেতে হবে? তুমি তো একমাস মোটে এসেছ।

আব্দারের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে নীলা বললে,—তা বিয়ের কনে আবার কদ্দিন থাকে?

—এক বৎসর।

—ওরে বাপ! তাহ'লে আমি ঠিক মরে যাব।—ব'লে সত্যি-সত্যিই নীলা কেঁদে ফেললে।

শ্রাবণ মাসে ওর বাপের বাড়ী যাওয়া হ'ল না। কিন্তু সেই সময়েই পটলা এল। পটলকে পেয়ে ও যেন বাঁচল।

পটলা লক্ষ্মীনারায়ণের পিস্‌তুতো ভাই। ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশে পড়ে, কিন্তু তাস খেলায় তুখোড়। ওকে পেয়ে নীলা যেন তার বাপের বাড়ীর নিজেকে ফিরে পেলে।

দু'দিনে পটলা একাধারে বৌদির বাজার সরকার এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী হ'য়ে দাঁড়াল। দোতালার কোণের ঘরে দুজনে গান করতে-করতে তুমুল হাতা-হাতি বাধে। রেগে পটলা বাইরে বেরিয়ে চ'লে যায়।

কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে বলে,—বৌদি, দু' আনা পয়সা দেবে? এমন চমৎকার ফুলুরী ভাজছে মাইরি—

আবার দুজনে ভাব হয়।

পিসিমা বলেন,—পটলা যে এখনও গাছে উঠল না বৌ, ছোঁড়ার অসুখ-বিসুখ হ'ল নাকি?

পটলা দোতালায় বারান্দা থেকে দাঁত খিঁচোয়।

অসভ্যতা পিসিমা দু'টি চক্ষে দেখতে পারেন না। রেগে বলেন,—আ হা হা, কি সভ্য ছেলে হ'য়েছেন!

নীলা ভেতর থেকে ডাকে,—পটল ঠাকুরপো!

পটলা একছুটে ভেতরে আসে। নীলা লুডোর ছক পেতে বসে রয়েছে।

পটলা বলে,—দেবো আর একদিন থান ইঁট ছুঁড়ে—যা' থাকে কপালে।

—কাকে ঠাকুর-পো?

—মাকে।—বলেই পটলা লুডোর গুঁটি চালতে আরম্ভ করে,—সিক্স! দুত্তোর! আমার দান কিছুতেই পড়তে চায় না।

বিপদ হ'ল লক্ষ্মীনারায়ণের।

এখন আর নীলা রাত-জাগার জন্যে তাগিদ দেয় না। সে যেন ঘুম চোখে ক'রেই ঘরের মধ্যে আসে। গল্প করতে করতে যদি লক্ষ্মীনারায়ণ একটুখানি চুপ করেছে, তার পরে আর ডেকে

নীলার সাড়া পাওয়া যায় না। ভোরের বেলা কখন উঠে চলে যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ তা জানতেও পারে না।

লক্ষ্মীনারায়ণ এতে বিরক্ত হয়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। কেবল ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

—দিন-রাত্তির জানালার ধারে বসে থাক কেন? দেখছ না, ছেলেরা খেলছে ওদিকে?

নীলা ভয়ে-ভয়ে ওদিক থেকে সরে আসে।

—পটলার সঙ্গে কি দিন-রাত্তির ছুটোপাটি কর! লজ্জা করে না? বয়স কি দিন দিন কমছে?

—আমি কি ঝগড়া করি না কি? ও-ই তো এসে—কিন্তু স্বামীর চোখের পানে তাকিয়ে নীলা ভয়ে-ভয়ে চুপ ক'রে যায়।

এর পরে নীলা লক্ষ্মীনারায়ণকে ক্রমাগতই এড়িয়ে চলতে লাগল।

কিছুদিন এমনি চলার পর লক্ষ্মীনারায়ণের মনে বোধ হয় করুণা জাগল। সেদিন দুপুর বেলায় নীলার ঘরে এসে উপস্থিত।

হাসতে হাসতে বললে,—কই দেখি, পান তো সাজা হচ্ছে খুব। দাও তো একটা পান।

নীলা পানের ডিবে এগিয়ে দিলে। এতদিন পরে ওর হাসি দেখে সে যেন হাতে স্বর্গ পেলে।

—অমনি ক'রে? চাইনে তোমার পান।

কেমন ক'রে ও পান চায় সে নীলা জানে। তবু অনেক

দিনের ব্যবধানের পর কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। একটুক্ষণ বসে থেকে তারপরে একটি একটি ক'রে দুটি পান সলজ্জ হাস্তে ওর মুখে দিয়ে দিলে।

ও কিন্তু এর পরে উঠে যাবার কোনো লক্ষণই দেখালে না। বললে,—দাও তো ঐ চয়নিকা বইখানা।

নীলা প্রমাদ গণলে। এই সময়টি পটলার সঙ্গে লুডো খেলার সময়। তবু বইখানি এনে দিলে।

—পড়েছ বইখানা?

নীলা ঘাড় নেড়ে জানালে, পড়ে নি।

লক্ষ্মীনারায়ণ গম্ভীরভাবে বললে,—দিনরাত্তির লুডো না খেলে এইগুলো বরং পড়। তাতে কাজ দেবে।—বলে পড়তে লাগল,—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি'
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি;
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্তে নাহি চল সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

—বুঝলে কিছু ? এদিকে এসো—

লক্ষ্মীনারায়ণ বাঁ হাতখানি নীলার পিঠের ওপর রাখলে। অত দুরন্ত মেয়েরও সে স্পর্শে যেন চোখ বুজে এল। সে আস্তে আস্তে নিজের মাথাটি ওর কাঁধের ওপর রাখলে। লক্ষ্মীনারায়ণ একটু হেসে আবার সুর ক'রে পড়তে লাগল,—

কোনোকালে ছিলে নাকি মুকুলিতা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশি !
আঁধারি পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
'মাণিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণি-দীপ-দীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে ?
যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

—বুঝতে পারলে ?

নীলা বললে,—তুমি দাও বুঝিয়ে।

লক্ষ্মীনারায়ণ কবিতা বোঝাতে লাগল। ইতিমধ্যে বারান্দায় কার পায়ের যেন অতি মৃদু শব্দ হ'ল, কে যেন অতি সন্তর্পণে এসে দোরের গোড়ায় দাঁড়াল।

লক্ষ্মীনারায়ণ বুঝিয়েই চলেছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সে দেখলে ছাত্রী একেবারে অন্যমনস্ক।

হেসে বললে,—কি ভাবছ বল তো?

নীলা চমকে বললে,—না ভাবিনি তো। তারপরে বল।

লক্ষ্মীনারায়ণ বললে,—কিছু ভাব নি?

এবারে নীলা অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে,—তুমি কি করে বুঝলে?

—আমি হাত গণতে জানি যে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

নীলা হঠাৎ উকিলের মতো জেরা ক'রে বসল,—বল তো দেখি, আমি কি ভাবছিলাম?

—বলব? তুমি ভাবছিলে, কখন এই কবিতা পড়া শেষ হবে।

নীলা দু'হাতে তালি বাজিয়ে একেবারে উৎফুল্ল হ'য়ে বললে, —হ'ল না, হ'ল না। কি ভাবছিলাম বলব?

—বল।

নীলা অপাঙ্গে একটু হেসে, দুবার ঢোক গিলে, আঙুলে আঁচলের প্রান্তটুকু জড়াতে জড়াতে বললে,—একটা টাকা দেবে?

—টাকা? কি হবে?

—আমার জন্যে নয়। পটল ঠাকুরপোর বিশেষ দরকার, তাই।

মুহূর্ত্তে লক্ষ্মীনারায়ণের মুখ কঠিন হ'য়ে উঠল। সে উঠে জামার

পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

নীচে নেমেই দেখে পটলচন্দ্র একটা চ্যালা-কাঠ হাতে ক'রে উঠানের ওপর বীরদর্পে দাঁড়িয়ে এবং উঠানের ও-কোণে পিসিমা তারস্বরে পটলের প্রতি দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করছেন।

একটু আগেই পটল দোতলায় বৌদির ঘরে আড়ি পাতছিল। এর মধ্যে কখন যে সে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে তা কেউ জানে না। কিন্তু এ যুদ্ধ-ঘোষণা তার পক্ষে মোটেই সমীচীন হয় নি। কারণ, তাকে পালাবার অবসর না দিয়েই লক্ষ্মীনারায়ণ একেবারে তার টুঁটি চেপে ধরলে এবং যে মারটা মারলে তা পৃথিবীতে শুধু পটলচন্দ্রের পক্ষেই পরিপাক করা সম্ভব।

নীলা দোরগোড়া থেকে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখলে।

সে-রাত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ একটি কথাও কইলে না।

নীলা ঘরে আসতেই ও পাশ-বালিশ আঁকড়ে পাশ ফিরে শুল। নীলা খাটের পা তলার দিকে চুপটি করে ঠায় ব'সে রইল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে-আস্তে একবার ওর পায়ের তলায় হাত দিলে। কিন্তু কোনো সাড়া পেলে না।

খাটের বাজুতে মাথা রেখে ও অঝোরে কাঁদতে লাগল। ওর মনে হ'ল, জীবনে এতবড় বিড়ম্বনা আর নেই। ওর মায়ের কথা মনে পড়ল, বাপের কথা মনে পড়ল। মনে হ'ল, এর চেয়ে যদি

বটুকের সঙ্গে বিয়ে হ'ত সেই হ'ত ভালো। তার সঙ্গে ভাব করা চলে, ঝগড়া করা চলে, গাছে-গাছে মাঠে-মাঠে খেলা করাও চলে। এর চেয়ে পটল ঠাকুরপোও ভালো। সে অমন ক'রে বাঁধে না,—তার মার ফিরিয়ে দেওয়া চলে।

ঠিক সেই সময়ে দরজায় শব্দ হ'ল,—খুট্ খুট্। কে যেন অতি সন্তর্পণে চাপা কণ্ঠে ডাকলে,—বৌদি!

নীলা একেবারে ঝাপিয়ে উঠে স্বামীর পা ঠেলে চীৎকার ক'রে বললে,—ওগো, ঐ দেখ, আবার এসেছে পটল ঠাকুরপো।

লক্ষ্মীনারায়ণের কিন্তু ঘুম ভাঙ্গল না। সে শুধু পা টা সরিয়ে নিয়ে বললে,—আঃ!

সে রাত্রে আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

কিন্তু পরের দিন সকালে পিসিমা চীৎকারে পাড়া মাথায় করলেন। পটলাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে যে কখন পালিয়েছে, কোথায় পালিয়েছে, কেউ জানে না।

সমস্ত দিন পিসিমা কাঁদলেন এবং জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করলেন না। আর সবাই ছুটল দিগ্বিদিকে পট্‌লাকে খোঁজবার জন্যে।

এ সময় নীলার কথা কারো মনে না হওয়াই স্বাভাবিক।

নীলাও কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে একটিবার পট্‌লার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনলে না। তার যে-অপরিণত মন এতদিন দুটি

দুর্ব্বল বাহু দিয়ে যত জঞ্জাল খেলাচ্ছলে কুড়িয়ে বেড়িয়েছে, একটি দিনে তা যেন দশটি বছর এগিয়ে গেল।

সূর্য্যাস্তের কাছাকাছি পটলাকে পাওয়া গেল। মাইল দুয়েক দূরে ময়ূরাক্ষীর বাঁকের মুখে যে আমবাগান, বেচারা সেইখানে ব'সে ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকছিল।

ছেলে ফিরে পেয়ে পিসিমা আর এক দফা কাঁদলেন। বাড়ীতে একটা কোলাহল পড়ে গেল।

কিন্তু যে মেয়েটি জন্মের মতো হারিয়ে গেল, সে তখন রুদ্ধ ঘরের মধ্যে ব'সে ফার্ষ্ট বুকের পড়া মুখস্থ করছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ লেখাপড়ার পক্ষপাতী।

রমানাথের ডায়ারী

বড় কষ্টেই বেচারী মারা গিয়াছে। বিদেশে বিভূঁয়ে কেহই তো যত্ন করিতে ছিল না, বুঝি ভগবান এই বৃদ্ধের অন্তিম সময়ে একটু শুশ্রূষা করিবার জন্যই আমাকে সেখানে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নহিলে আর কোন সঙ্গত কারণে সেখানে যাইবার ইচ্ছা জাগিবে, এমন তো দেখি না।

কিই বা করিয়াছি! হয়তো জলের গ্লাসটা আগাইয়া দিয়াছি, মিনিট কতক বা বাতাস করিয়াছি। তবে হ্যাঁ, এই বৃদ্ধ বাঙালীকে অন্তিমে সঙ্গ দিয়াছি, বাংলা দেশের গল্প বলিয়াছি।

বুঝি ইহার বেশী আর তাহার প্রয়োজনও ছিল না। ডাক্তার ডাকিতে দেয় নাই, ঔষধ খায় নাই। বলিত, না, না, কিছু দরকার নেই।

ভালো বিপদেই পড়িয়াছিলাম!

তবে আশ্চর্য্য শান্ত। মার্ব্বেলের মত বিবর্ণ মুখের উপর যন্ত্রণার একটুও কি চিহ্ন ফুটিতে দেখিলাম! একবারও বলে নাই,

মাথাটা ব্যথা করিতেছে,—কি পা-টা একটু টিপিয়া দাও। যেন একলা মরিবার সমস্ত দুঃখ সহিতে প্রস্তুত হইয়া, সকল কথা ভাবিয়াই এখানে আসিয়াছিল।

শুধু বলিত, গল্প বল।

যেন আমার কাছ হইতে এই মুমূর্ষুর এইটুকুরই প্রয়োজন ছিল। আমি গল্প করিতাম, বাংলা দেশের অসংখ্য গল্প।

জিজ্ঞাসা করিত, তোমার বিয়ে হয়েছে?

হাসি আসিত। বলিতাম, হ্যাঁ।

বৃদ্ধের সমস্ত দেহ নড়িয়া উঠিত, যেন আগ্রহে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে চাহে।

—তবে সেই গল্প বল, বাবাজি, বৌমার গল্প।

লজ্জায় বলিতে পারিতাম না।

বুড়া হাসিত। বলিত, তোমার আর কতই বা বয়স হবে বাবাজি, বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ, কি বল?

বলিতাম, হ্যাঁ, ঐ রকমই।

—তাহ'লে বৌমার বয়স ষোলো-সতেরো, কি বল?

কিছুই বলিতাম না।

—ছেলে-পুলে হয়েছে?

না।

বুড়া আর কিছুই বলিত না। কড়িকাঠের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। কি ভাবিত, সেই জানে।

কত গল্প করিতাম। কখনও ফোঁকলা দাঁত বাহির করিয়া হাসিত, কখনও বা দুই চোখের কোণ বহিয়া অশ্রু ঝরিত।

এমনই একদিন গল্প শুনিতে শুনিতে চক্ষু বন্ধ করিল আর খুলিল না।

চাকরদের ডাকিয়া কোনোরূপে বৃদ্ধের সৎকার করা গেল। পুলিশেও সংবাদ দেওয়া গেল। পুলিশ আসিয়া বাক্সের ভিতর হইতে উইল বাহির করিল।

সংক্ষিপ্ত উইল। কাহাকে কত টাকা দেওয়া হইবে তাহার পরিমাণ দিয়া শেষের দিকে লেখা আছে, তাহার ডায়ারীগুলা পুড়াইয়া ফেলা হইবে।

ডায়ারীগুলাই বটে। মোটা মোটা খান বিশেক খাতা। বুড়া এই নির্জ্জনে বসিয়া-বসিয়া বুঝি শুধু ডায়ারীই লিখিয়াছে, আর কিছু করে নাই।

সাহেবকে সেলাম দিয়া বলিলাম, সাহেব ওগুলো পুড়াইয়া আর কি করিবে, বরং আমাকে দিয়া দাও।

সাহেব একটা মিলিটারী এবাউট-টার্ণ দিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি কে?

বলিলাম, কেহই নই সাহেব। বৃদ্ধের মৃত্যুর পূর্ব্বাহ্নে কি করিয়া এখানে আসিয়া জুটিয়াছিলাম, জানি না। তার পরে যতক্ষণ ছিলাম, কেবল গল্প বলিয়াছি।

সাহেব বলিল, তুমি এগুলা ছাপাইয়া বিক্রী করিবে না তো?

বলিলাম, ছাপাইতে হয়ত পারি। কিন্তু বিক্রি করিব না, শপথ করিতেছি। তবে অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে ছাপাইবার প্রয়োজন বোধ হয় হইবে না, উইলের নির্দ্দেশ অনুসারেই চলিতে হইবে।

সাহেব কি ভাবিল সেই জানে, বইগুলি আমাকে দিয়া দিল।

বৌকে বলিয়াছি, বুড়া তোমার বয়স জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

বৌ হাসে।

দুজনে মিলিয়া সবগুলি পড়িলাম। বৌ কাঁদিল, আমি হাসিলাম,—এক প্রস্থ বৌএর কান্না দেখিয়া, একপ্রস্থ ডায়ারীর লেখা দেখিয়া।

বৌকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কাঁদ কেন? এতে কাঁদবার কি আছে?

বৌ চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,—তুমি বুঝবে না। তুমি পাষাণ।

তা হবে। Nonsense দেখিয়া যাহারা কাঁদিতে না পারে, দুনিয়ায় তাহাদেরই পাষাণ বলে।

সে যাহা হউক, আমি পাষাণ কি না, আপনারাই বিচার করুন।

স্ত্রীর নির্দ্দেশ মত আমি ডায়ারী হইতে জায়গা বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সমস্তটা তো ছাপাইতে পারি না;—পুলিশের হুকুম নাই।

১২৮০ সাল, ২৩শে মাঘ।—ছাই বউ হইয়াছে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। মামাবাবুর পছন্দ আছে! পাশ ফিরিয়া গল্প করিতে বলিলে বলে, ঘুম পাইতেছে। বলিলাম, এরই মধ্যে ঘুম? এই তো সবে ন'টা। বলিল, ন'টাই হউক আর দশটাই হউক, আমার ঘুম পাইতেছে, আমি ঘুমাইব। মনে মনে বলিলাম, তাই ঘুমাও, আর যেন জাগিতে না হয়। সমস্ত রাত্রি ঘুমই হইল না।

১২৮১ সাল, ১৫ই ভাদ্র।—হ্যাঁ, ইহাকেই বলে অদৃষ্ট! গত জন্মে কত পাপ করিয়াছি জানি না, এজন্মে তো যন্ত্রনার অন্ত নাই। পাশে সুখসুপ্ত স্ত্রী, বাহিরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে, আমি বিরহ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছি। ঝগড়াই হইয়া গেল। আমিও যা-বলিবার-নয় তাই বলিয়াছি, সেও খাতির করে নাই। বুঝাইয়া দিয়াছে, দশ বৎসর বয়স হইলেও ঝগড়ায় আঠারো বছরের

ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারে।···ইহার চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়াও ভালো। বেশ ছিলাম বিবাহ না করিয়া। বুড়ীর সথ হইল নাতির বিবাহ দিয়া আহ্লাদ করিবেন। আহা, কি বিবাহই দিয়াছেন!···সন্ন্যাসীই হইব, দেখুক বুড়ী মজা!

২০শে আশ্বিন।—নিজের পকেট খরচ বাঁচাইয়া একটি আংটি কিনিয়া দিলাম। ভারি খুসী। একবার এ আঙুলে পরে, একবার ও আঙুলে পরে। একখানি হাত কোলের উপর টানিয়া লইলাম, বাধা দিল না। টেবিলের উপরের ফুলদানির দিকে চাহিয়া রহিল, যেন হাতখানি টানিয়া লওয়া জানিতেই পারে নাই। সমস্ত হাত আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে।...ঠোঁট মুছিয়া বলিল, জান, ২০শে অগ্রহায়ণ আমার যাইবার দিন হইয়াছে। বলিলাম, সে কি? বড়দিনের ছুটি আসিতেছে, আর তুমি চলিয়া যাইবে? হাসিয়া বলিল, ছুটিতে তুমি সেখানে যাইবে না বুঝি, বেশ!

১৫ই পৌষ।—কয়েকখানিই চিঠি লিখিলাম, উত্তর নাই। ভুলিয়াই গিয়াছে আর কি! মা-বাপ, ভাই-বোন, সঙ্গী-সাথী সবই

পাইয়াছে, আমাকে আর তাহার কি প্রয়োজন? তাই হউক, আমিও চিঠি লেখা বন্ধ করিলাম। আমাকে যদি তাহার মনে না থাকে, তাহাকেই বা আমি মনে রাখিব কেন? ইংরেজদের ডাইভোর্স প্রথা বেশ! নহিলে উহাদের অত উন্নতি হয়!

১২৮৭ সাল, ১৮ই অগ্রহায়ণ।—ভয়ানক রাগ করিয়াছে; গেল শনিবারে আসিতে পারি নাই, তাই। কত করিয়া মান ভাঙিলাম। বাস্তবিক, আমারই অন্যায়! মত্ত যৌবন যাহার সর্ব্বাঙ্গ অহর্নিশ পীড়িত করিতেছে, সে একা থাকে কেমন করিয়া! তবু ইহার দোহাই দিয়া পরীক্ষকের হাত হইতে তো নিষ্কৃতি নাই। দুইবার ফেল করিয়াছি। এবারে কি হইবে, তাহা ভগবানই জানেন। দূর হউক আর ভাবিতে পারি না। যাহা হইবার তাহাই হইবে।... কি নিষ্ঠুর সিদ্ধার্থ, চৈতন্য! সুখসুপ্ত পরিপূর্ণ-যৌবনা প্রিয়ার বাহুপাশ ছিঁড়িয়া যাইতে যাঁহাদের বাধিল না, জীবে প্রেম প্রচার করিলেন তাঁহারাই। ওগো দেবতা, মর্ত্ত্য তোমাদের পাইয়া ধন্য হইয়াছে, তৃণটি পর্য্যন্ত তোমাদের করুণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা সকলের চেয়ে বুকের একান্ত নিকটে তোমাদের পাইয়াছিলেন, যত ব্যথা তাঁহাদেরই দিয়া গেলে? জীবের দুঃখ বুঝিলে, শুধু জীবনের দুঃখই বুঝিলে না?

১২৮৮ সাল, ১০ই আষাঢ়।—এবারেও ফেল করিলাম। বাবা বলেন, আর নহে বৎস, বিদ্যার্জ্জন যথেষ্ট করিলে, এইবার কিঞ্চিত অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিলে তোমার এবং সংসারের উভয়ের পক্ষেই ভাল হয়। আমার যে মাতুল ছেঁড়া ন্যাকড়ার ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন, বাবা আমাকে তাঁহারই সঙ্গে জুটাইয়া দিতে চাহেন। সে মামাকেও বহুবার দেখিয়াছি। আমাদের বাড়ীতে আসিলে "মিষ্টি খাইবার জন্য" প্রতিবার দুই আনা করিয়া পয়সা দিয়া যাইতেন। তাহাই দেখা যাউক। পাঠ্য পুস্তক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হয়রাণ হইয়াছি, এবারে ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া লক্ষপতি না হই, সহস্রপতি হইলেও বাঁচিয়া যাইব। বন্ধুদের ইচ্ছা নাই। বলে তোর এত কবিত্ব কি এই জন্যই সঞ্চিত হইয়াছিল? কালিদাস, সেক্সপীয়ারকে শেষে বস্তায় ঠাসিয়া মারিতে চাও? ইনি বলেন, তাতে কি হয়েছে? ছেঁড়া ন্যাকড়া তো তোমাকে খাইতে হইবে না। বিক্রি করিবে টাকা পাইবে। চাঁদের আলোতে পেট ভরিবে না।

৯ই কার্ত্তিক।—বন্ধু বলেন, মানুষের জীবনের ইহাই ট্রাজেডি,—একপত্নিত্ব, কিম্বা একপতিত্ব। তোমরা যাহাকে একনিষ্ঠ প্রেম বল, তাহার কোথাও অস্তিত্ব নাই, কবির মস্তিষ্ক ছাড়া।

আসলে, বহু বিবাহের বীজ মানুষের রক্তের মধ্যে উপ্ত রহিয়াছে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তবে কি বলিতে চাও, শত-নারীবেষ্টিত নবাব-বাদশাহদের কার্য্যই নীতি-সঙ্গত?

বন্ধু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নীতির কথা নহে, মানুষের জীবনে ইহাই অনিবার্য্য। মানুষের স্বভাব নীতিরত্নমালার শ্লোকের সরল রেলপথের উপর দিয়া চলে না, চলিতে চাহিবে না।

তাহা তোমাকে দেখিয়াই বুঝিতেছি। বলিলাম, চলা তো উচিত। স্বভাবকে সংযত করিলে ক্ষতি কি?

বন্ধু অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, ক্ষতি সমূহ। প্রণয়ী পাইতে চাহে সমগ্র নারীমনকে। কিন্তু কোনো একটি নারীই সমগ্র নহে, খণ্ডমাত্র। এই বিচিত্র, বহু খণ্ড-মনের ভিতর দিয়া তবে সমগ্র নারীকে পাওয়া যাইবে। বন্ধু, নারীর হৃদয়পথ এত সুগম নহে।

হাসিয়া বলিলাম, তোমার কথাই না হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু সমগ্র নারী-হৃদয় ব্যবচ্ছেদ করিলেই কি প্রেয়সীকে পাওয়া যাইবে? তুমি কি বলিতে চাও, বেশ্যারা তাহা হইলে সমগ্র পুরুষ হৃদয় পাইয়াছে?

বন্ধু বলিলেন, তা কেন পাইবে? তাহারা তো কাহাকেও ভালোবাসে নাই। বন্ধু, তোমার জীবনের চলার পথে কত বান্ধবীই আসিবে। কাহারও হাসি তোমার ভালো লাগিবে, কাহারও

ভালো লাগিবে কথা, কাহারও গান। এমনই করিয়া শত বান্ধবীর দেওয়া শত বিন্দু সুধার তোমার পানপাত্র ভরিয়া উঠিবে, সেই তো সুখ।

কি জানি। মন বলে, না, না, না। মনে পড়ে পাঁচ বছরের মণ্টুর কথা। মণ্টু বলে, সে সব চেয়ে ভালোবাসে ভোলা কুকুরটাকে। ভোলার বড় বড় লোম তাহার ভালো লাগিয়াছে।

হাসি, কথা, গান। আমি চাহি, যে দিন জানালার ফাঁক দিয়া পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাঁদের আলো তাহার সুপ্ত মুখের উপর আসিয়া পড়িবে, সেদিন তাহার শ্যামল মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব,—শুধু চাওয়া, একদৃষ্টে অপলক চাহিয়া থাকা,—কথা নয়, হাসি নয়, গান নয়।

১২৯৫ সাল, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ।—একটা কাপ ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া বকিয়াছিলাম। অভিমানে তিন দিন কথা কহে নাই। বড় অভিমানী। ভাবে, এত টাকা রোজগার করিতেছি, একটা কাপের কি-ই বা মূল্য! একটি পয়সা কেমন করিয়া গিনিতে পরিণত হয় তাহা তো জানে না! বলে, না-খাইয়া না-পরিয়া টাকা জমাইতেছ কাহার জন্য? তবু যদি ছেলে পুলেও থাকিত! আরে, টাকা জমাই টাকা জমাইবার জন্যই,—টাকা জমাইতে

ভালো লাগে বলিয়া। ছেলের মুখ দেখিলে তো আর তামার পয়সা সোনা হইয়া যাইবে না। বুঝিতে পারে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তো আর উহাকে টাকা রোজগার করিতে হয় না। একটু আদর করিয়া কাছে টানিতেই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অনেক করিয়া কান্না থামাইলাম। একটু পরেই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিলাম,—হাস যে!

একটা কথা মনে পড়িল।

কি কথা?

আমি মরিয়া গেলেও তুমি কিছুতেই বিবাহ করিবে না।

কি করিয়া জানিলে?

তাহাকে খাইতে দিতে হইবে যে।—বলিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।

তাহার মাথাটা বুকের উপর রাখিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলাম, —সে জন্য নয়। প্রয়োজন হইবে না বলিয়াই বিবাহ করিব না। আমি বেশ বুঝিতেছি, তোমাকে পাওয়া আমার সম্পূর্ণ হইয়া গেছে। তাই আর হারাইবার ভয় নাই। এই পৃথিবীর ভিতরে, এই পৃথিবীর বাহিরে, কোথাও, কোনোখানেই তোমাকে আমার হারাইবার যো নাই।

দেখিলাম, তাহার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিয়াছে।

২৯শে আষাঢ়।—দেখিতেছি, আমাকে ফকির করিবার চেষ্টায় আছে। দুই হাতে সদাব্রত আরম্ভ করিয়াছে। নগদ পয়সা হাতে পায় না, চাউল দিয়াই কাজ সারে। তাইতো ভাবি, একমণ চাউলে একমাস চলে না কেন! ভিতরে-ভিতরে গৃহিণী যে দাতাকর্ণ হইবার চেষ্টায় আছেন এ কথা তো জানিতাম না। বলিলাম, দানসত্র খুলিতে চাও, বাপের বাড়ী গিয়া খুলিও। আমার মুখ-দিয়া-রক্ত-উঠা পয়সা আমি এমনভাবে নষ্ট হইতে দিতে পারিব না। রাগ করিয়া ভাঁড়ারের চাবি আমার পায়ের কাছে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া গেল। বাঁচা গেল। নিজের সংসার নিজে না দেখিলে চলে?

১লা শ্রাবণ।—জিজ্ঞাসা করিল, তাহার সহিত ঝিএর তফাৎ কি? কথা শুনিলে গা জ্বালা করে। ভাবে, দুই হাতে খরচ করিয়া গৃহস্থকে ফকির করিবার অধিকার না থাকিলে বুঝি গৃহিণী হওয়া যায় না। বলিলাম, কোনো তফাৎ নাই, কেবল সে মাহিনা নেয়, তুমি মাহিনা নাও না। মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। গাল দুইটা যেন বানরে চড় মারিয়া বসাইয়া দিয়াছে। চোয়ালের হাড় যেন পাহাড়ের সহিত

পাল্লা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। চোখ দুইটা তো ভিতরের দিকে ডুব মারিয়াছে। রংও দিন-দিন খুলিতেছে। বলিলে বলে, মরিয়া গেলে একটা রূপসী দেখিয়া বিবাহ করিও। ঝাঁঝটুকু আছে!

৩রা আশ্বিন।—ভাঁড়ারের চাবিটা লওয়ার পর হইতে সেই যে কথা বন্ধ করিয়াছে, আর কথা বলে নাই। মধ্যে একদিন রাত্রে...হ্যাঁ, তা সেজন্য ভাঁড়ারের চাবিটাই ঘুস দিতে হইয়াছিল।

এখন মনে পড়িলে হাসি পায়। একখানা হাত তাহার গায়ের উপর ছড়াইয়া দিলাম,—যেন ঘুমের ঘোরে-ঘোরে। বাধা দিল না,—যেন জানিতেই পারে নাই,—যেন আরামে নিদ্রা যাইতেছে। কিন্তু নিশ্বাসের শব্দ বদলাইয়া গেল। শুধু নিশ্বাসের শব্দ নহে, সে রাত্রে একই শয্যায় শুইয়া দুইটি নিয়ত দ্বন্দ্ব-নিরত মানুষও একেবারে বদলাইয়া গেল এবং অন্তরের নিভৃত কোণে যে দুইটি প্রণয়ী ঘুমাইতেছিল তাহারা জাগিয়া উঠিয়া বাসর শয়ন বিছাইল। মনে হইল, এ যেন সেই ফুল শয্যার রাত্রি। কেহ কোনো কথা কহিল না। যে দুইটি মানুষ প্রত্যহের খুঁটি-নাটি লইয়া অহর্নিশ দ্বন্দ্ব করিত তাহারা যেন মরিয়া গিয়াছে।

আস্তে-আস্তে ভাড়ারের চাবিটা তাহার আঁচলে বাঁধিয়া দিলাম। বাধা দিল না, শুধু বুকের কাছে সরিয়া আসিল,—যেন ঘুমের ঘোরে-ঘোরে।

সকালে ঘুম ভাঙিলে দেখিলাম, ভাড়ারের চাবিটা শিয়রের কাছে পড়িয়া আছে।

৫ই অগ্রহায়ণ।—অকস্মাৎ শুষ্ক শাখা যেন মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। অঙ্গে-অঙ্গে লাবণ্য উচ্ছ্বসিত হইতেছে। গাল দুটি আগের মতো আবার যেন টুলটুল্ করিতেছে। গৃহিনীর বয়সে কি জোয়ার আসিল না কি? জিজ্ঞাসা করিতে বড় লোভ হয়। কিন্তু কথা যে সেই হইতে বন্ধ আছে। কিছুদিন হইতেই দেখিতেছি, আমার ঘরে কে যেন রোজ সমস্ত গুছাইয়া দিয়া যায়, —আগের মতো। মধ্যে আমার এ দিক বড় একটা মাড়াইত না। কিন্তু কিছুদিন হইতে দ্বারের কাছে প্রায়ই কার যেন পায়ের সাড়া পাই। আজ ধরিয়া ফেলিয়াছি।

শশব্যস্তে কহিল,—আঃ ছাড়!

তাহার লজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যেন কচিবধূ। বলিলাম, আচ্ছা ঘরে এসো।

টেবিলের উপর একটা হাতের ভর দিয়া বলিল,—কি, বল?

কিছুই বলিলাম না, শুধু মৃদু হাসিয়া স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাহার চোখের পানে চাহিয়া রহিলাম। লজ্জায় সে দৃষ্টি নত করিল।

একটু পরে বলিলাম, কি যেন শুনিতেছি ?

মাথাটা তাহার একেবারে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কি মনে হইল, আস্তে আস্তে তাহাকে স্পর্শ করিলাম, বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া ললাটে একটি চুমু দিলাম; অমনি বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে কী কান্না! ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া নিঃশব্দে কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। আমার চোখও শুষ্ক ছিল না। রিং হইতে ভাঁড়ারের চাবিটা খুলিয়া শুধু বলিলাম, ভাঁড়ারের চাবিটা নাও।

একমিনিট আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিল, তারপর বলিল,—দাও।

৮ই পৌষ।—এক মুহূর্ত্ত কাছ ছাড়া করিতে চাহে না। বড় ভয় হইয়াছে। বলে, তুমি আমাকে অনেক জ্বালাইয়াছ। এবারে আমার পালা। এ কয়মাস আমিও তোমায় ঘুমাইতে দিব না। শুধু ফুলশয্যার রাত্রের গল্প করে। কত কথাই হয়তো তাহার মনে পড়ে, আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে। আমি বলি,

ভারি তো ফুলশয্যা। একটা কথা কহিতেও তো তোমায় ভয় করিত। হাসে। বলে, ভয় নয়, ভয়েরই মতো। তুমি ছুঁলে সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিত, গলা শুকাইয়া উঠিত,—তোমার ছোঁয়া সহ্য করিতে পারিতাম না।

একটু থামিয়া জানালার বাহিরের আকাশটুকুর দিকে চাহিয়া যেন আপন মনেই বলিতে থাকে, শুধু মনে হইত দিন রাত্রি তুমি আমার কাছে থাক, কিন্তু কাছে আসিলে সহ্য করিতে পারিতাম না। মনে হইত তোমার পানে চাই, চোখ মেলিতে পারিতাম না।

ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসি খেলিয়া উঠে। তারপর কখন আলস্যে ঘুমাইয়া পড়ে।

কতটুকুইবা ঘুম! খানিক পরেই ধড় মড় করিয়া উঠিয়া আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলে,—বাঃ, বেশ তো! ঘুমাইয়াছি বলিয়া আমাকে বুঝি আর জাগাইতেও নাই? তুমি তো তাই চাহিবেই। বেশ, বেশ।

রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়। কত করিয়া তবে মান ভাঙাই।

একটু পরেই কি ভাবিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরে, বলে,—সেই আগে তুমি এমনই ঘুমাইয়া পড়িতে, আমি জাগাইয়া দিতাম না বলিয়া কত রাগ করিতে। মনে পড়ে?

আমি হাসিয়া ঘাড় নাড়ি। ও আপন মনে বলে,—ঠিক এমনি, ঠিক এমনি।

১১ই ফাল্গুন।—একটু হয় তো ঘুম আসিয়াছে, ঠেলা দিয়া বলে,—বাঃ, ঘুমাইতেছ বুঝি? সে হইবে না।

দুবাহু দিয়া গলা জড়াইয়া বলে,—আর কয়টা মাসই বা! এ কয়মাস না-ই ঘুমাইলে!

হয়তো বলে,—আচ্ছা, না, না, ঘুমাও। তোমার আবার না ঘুমাইলে অসুখ করিতে পারে।

অপ্রতিভভাবে বলি,—না, না, ঘুমাই নাই। একটু চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিতেছিলাম।

আমাদের বিবাহের পনেরোটি বৎসর ও যেন দিন রাত্রি ধরিয়া রোমন্থন করিতেছে। ইহারই আনন্দে বিভোর হইয়া ও যেন মাটির পৃথিবী ছাড়িয়া কোন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছে। কখন যে কোন কথা মনে পড়ায় হাসিয়া উঠে তাহার স্থিরতা নাই।

হয়তো বলে,—সে দিনের কথা আমি কোনো মতেই ভুলিব না। একখানা হাত আমার গায়ের উপর পড়িল, যেন ঘুমের ঘোরে! কি দুষ্টু!

বলিতে বলিতে মুখে আঁচল চাপা দেয়। মনে করিতে লজ্জা হয় বুঝি।

একটু পরেই হয়তো অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলে,—আচ্ছা, বলতো ছেলে হইবে, না মেয়ে হইবে?

সে কি আমি জানি ছাই? যা মুখে আসে তাই বলি। বলি, —মেয়ে হইবে।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলে,—না, না, মেয়ে না,—ছেলে।

তার পরে ভাঁড়ারের চাবিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলে,—এ চাবি আর পাইবে না। যখন ছেলের বৌ আসিবে আমি নিজের হাতে তাহার আঁচলে বাঁধিয়া দিব।

দশ বছরের খুকীর মতো মাথা দুলাইয়া-দুলাইয়া কথা কয়।

১২ই ফাল্গুন।—কতকগুলা জরুরী বিলাতী চিঠি লিখিতেছিলাম, আসিয়া বলিল,—বাবা তোমাকে চিঠি দিয়াছেন, আমাকে লইয়া যাইবার জন্য।

বলিলাম,—বেশ তো।

সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—না, না, সে হইবে না। মরি যদি—একটা ঢোক গিলিয়া বলিল,—মরি যদি তোমার কোলে—না, না, রাগ করিও না। সত্য আমার মরিতে ইচ্ছা করিতেছে না। তবু—কি জানি, বড় ভয় হয়।

তাহার ডান হাতখানি আমার কাঁধের উপর রাখিল।

তাহার বাম হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া একটু নাড়া দিয়া বলিলাম,—না, না, তোমার যাওয়া হইবে না।

১২৯৬ সাল, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।—পুত্রই হইয়াছিল। কিন্তু বেচারী পৃথিবীর আলো আর দেখিতে পায় নাই। তা হউক, সে জন্য দুঃখ করি না, কিন্তু উহাকেও বুঝি হারাইতে হয়। ডাক্তার তো জীবনের আশা নাই বলিয়া গেলেন।

১৮ই মাঘ।—কর্ম্মাটারের বাড়ীটা তৈয়ারী হইয়া গেলে বাঁচি;—আর ভালো লাগে না। এই ভাইপোটি আমার ব্যবসা রাখিতে পারিবে। হাঁটিয়া পারিলে আর গাড়ী ভাড়া করিতে চাহে না। কোনো রকম বাবুগিরিও নাই।

দাদা বলিতেছেন, বিবাহ কর। এমন করিয়া থাকিতে নাই। তেত্রিশ বৎসর বয়সে অনেকে প্রথম বিবাহ করে। যেন বয়সটাই মানুষের বিবাহ করিবার পক্ষে একমাত্র বাধা। মন যে বয়সের সঙ্গে সমান্তরাল চলে না এ কথাটা লোকে বুঝিতে চাহে না। দাদার কথা শুনিয়া হাসি পায়। কর্ম্মাটারের বাড়ীটা কত দিনে শেষ হইবে কে জানে। বেটারা তাড়াতাড়ির অছিলায় খুব দুই পয়সা লুটিয়া লইল। বলে তো আর মাস তিনেকের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে।

১২৯৭ সাল, ১৩ই আষাঢ়। মা বাবা কাঁদিলেন, দাদা কত দুঃখ করিলেন। কি করিব? ভালো লাগে না যে! ওখানে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এই বেশ ভালো। লোক নাই, লোকালয় নাই। যেদিকে চাই দিগন্তপ্রসারী মাঠ, নীল গিরিশ্রেণী। মাঝে মাঝে উদাস হাওয়ায় কৃষকের গান ভাসিয়া আসে। চাকরটা লোক মন্দ নয়, বেশ চালাক-চতুর। তবে চুরিতে হাত একেবারে পাকিয়া গিয়াছে। বলিলে, উলটাইয়া আমাকেই ধমক দেয়। মনে হয়, ঘাড় ধরিয়া বেটাকে বাহির করিয়া দিই। হৈ চৈ করিতে ভালো লাগে না, চুপ করিয়া যাই। আজ ওর দেশের ঠিকানাটা লিখিয়া লইব। কোন দিন দু'পাঁচটা জিনিষ হাতাইয়া পলায়ন করিলে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হইবে। তবে কি লই-য়াই বা পলাইবে? তা হউক, তবু সাবধানে থাকা ভালো। এক আধখানা বাঁসন-কোসন লইয়াও তো পলাইতে পারে। তবে, কৌশলে ঠিকানাটা জানিয়া লইতে হইবে। উহাকে সন্দেহ করি জানিতে পারিলে, চীৎকার করিয়া হাট বাধাইবে। ভালো বিপদেই পড়িয়াছি!

১৩০০ সাল, ১৯শে বৈশাখ। একদিক দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বাপ-মা বলিতে আর কেহ রহিল না। গঙ্গার কোলে

শ্মশানের চিতায় তাঁহাদেরও রাখিয়া আসিলাম। আশ্চর্য্য কিন্তু। একই ঘরে দুটি রোগী যেন পরামর্শ করিয়া এক সঙ্গে দেহত্যাগ করিলেন। ভাবিলেও আনন্দ হয়। আমার কাছে সবাই কাঁদিতে আসে। আমি কি করিব বাপু! কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিবার কোনো মন্ত্র তো আমার জানা নাই! কাঁদে! কাঁদিবার কি আছে বাপু! চোখের সামনে হইতে সরিয়া গেলেই কি মনকে ফাঁকি দেওয়া যায়? কেন, এই তো আমি বেশ আছি। কষ্ট? হ্যাঁ, কষ্ট, একটু হয় বই কি! মাঝে মাঝে তাহাকে স্পর্শ করিতে চাই, পাই না। বুকটা কেমন করিয়া উঠে। তাই বলিয়া কাঁদিব কেন? তাহাকে হারাইয়া তো ফেলি নাই। যেমন করিয়া এই আঙুল-গুলাকে দেখিতেছি, ঠিক তেমনি স্পষ্ট দেখিতেছি, তাহাকে হারাই নাই।

১৩১৫ সাল, ১৫ই কার্ত্তিক। কোন কাজ নাই। অপরাহ্নে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া বসিয়া শাল গাছ কয়টির আড়ালে সূর্য্যাস্ত দেখি। বেশ লাগে। মনে হয়, এইখান হইতে সূর্য্যাস্ত দেখিবার জন্যই বুঝি কেহ ওইখানে শাল গাছ কয়টি লাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আবার ফিরিয়া যাই। তেমনি করিয়া আবার ছেঁড়া ন্যাকড়ার বস্তায় নম্বর দিই। তেমনি করিয়া সহরময় রাস্তায়

রাস্তায় ছুটিয়া চলি। পারি না যে! নাড়া দিলে মনে ব্যথা করে। সমস্ত মন কেমন যেন বরফের মতো জমাট হইয়া গিয়াছে—নড়ে না, চড়ে না, তরঙ্গ তুলে না। কিন্তু বেশ লাগে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে।

১৩২৫ সাল, ১৭ই আশ্বিন। পঞ্জিকায় দেখিলাম, আজ নাকি দুর্গা পূজা। চাকরটা বলে, তাহাদের দেশে নাকি পূজা হয় না। হবে। আজকাল বোধ হয় আমাদের দেশ হইতেও পূজা উঠিয়া গিয়াছে। কে করিবে? কম খরচ! তখন ব্যবসা করিতাম, কত টাকা আসিত। বেশ ব্যবসা এই ছেঁড়া ন্যাকড়ার। কত রং-বেরঙের ন্যাকড়া—লাল, নীল, সবুজ আরও কত কি রং মনে নাই। বিলিতি ডাকের কত চিঠি। চেক, ব্যাঙ্ক, ডি-এ, ওভার ড্রাফ্‌ট্ আরও কত নাম। বেশ নামগুলি। সব মনে নাই। কত টাকা! তখন সে বাঁচিয়াছিল। এই তো সেদিন মারা গেল, দুই বৎসর, তিন বৎসর কি কত বৎসর হইল। আমারই চোখের সামনেই তো মরিল। ভাঁড়ারের চাবিটা যাইবার সময় আমার হাতে দিয়া গেল। কি যেন তার সাধ ছিল, কাহার হাতে যেন দিয়া যাইবার কথা ছিল। দিতে তো পারিল না; আমারই হাতে দিয়া গেল। সেই ভাঁড়ারের চাবিটা। সে দিন তো তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলাম।

একটু কাঁদিয়া ছিল বুঝি। বড় বেশী খরচ করিত। গৃহস্থের বধূ, অত খরচ করিতে নাই! এ চাকরটাও বড় খরচ করে। সে দিন দুইটা পয়সা বালিশের নীচে রাখিয়া ছিলাম বেশ মনে হইতেছে। আজ দেখিতে পাইলাম না। চাকরটা বলে, আপনি ভুল করিতেছেন। ওখানে নিশ্চয় রাখেন নাই। তা হবে। গোলমাল করিতে আর ভালো লাগে না। কর, যত পারিস চুরি কর, শুধু দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে দিস বাপু।

১৩৩০ সাল, ১১ই আষাঢ়।—ওই গ্রাম খানি বেশ। সব গ্রামই বেশ। ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম। কত ঘরই বা লোক হইবে? চাকরটা বলে বেশী নয়। তাই হবে। চাকরটাকে বলিলাম, হ্যাঁরে ও গ্রামের লোকের সঙ্গে এ গ্রামের লোকের বিবাহ হয় না? ও গ্রামের ছেলের সঙ্গে এ গ্রামের মেয়ের? ছোট্ট মতন বর, মাথায় টোপর, পরণে নীল রঙের বেনারসী কাপড়, তাতে জরির পাড়। পাল্কী চড়িয়া আমার বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়া যাইবে। অনেক লোক, অনেক বাজনা, অনেক আলো। হয় না? ফেরার পথে আগের পাল্কীতে যাইবে শ্যাম বর্ণের ছোট্ট একটি মেয়ে, পরণে লাল রঙের চেলীর কাপড়, মাথায় একটু ঘোমটা,—চারিদিকে বড় বড় চোখ মেলিয়া তাকাইতে তাকাইতে যাইবে। হয় না?

চাকরটা হাসে! বলিলাম, আমার এখানে না হয় একটু মিষ্ট-মুখ করিয়াই গেল। কত আর খরচ হইবে! খালি মুড়ি আর মুড়কি, ব্যস। চাকরটা সব কথা বুঝে না, তাই শুধু হাসে।

বুড়ার কলম এইখানে থামিয়াছে, আর লেখে নাই। বুঝি লেখার মতো অবস্থাও আর ছিল না। হয়তো এই চার বৎসর ধরিয়াই একটা না একটা রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিল।

কালের কপোল তলে—

শ্রীশ ও সুরেশের কথা উঠিলেই সকলে একবাক্যে বলিত, ইহাদের দু'জনের যদি কিছু হয় তো...

ভবিষ্যৎ জীবনে কথাটি অর্দ্ধেক ফলিয়া গেল। তিনবার এণ্টান্স ফেল করার পর দুজনেই ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সুরেশ একটা সওদাগরী অফিসে কেরাণীগিরি করিতে লাগিল, আর শ্রীশ নানা ব্যবসায় ঠোকর দিতে দিতে শেষটা এক জায়গায় লাগিয়া গেল এবং কিছুদিন পরে একটা মস্ত বড় বাড়ী ফাঁদিয়া বসিল।

অভাব বড় কাহারও কিছু ছিল না। সুরেশের পরিবারের মধ্যে সে ও তার স্ত্রী। মাহিনা যাহা পাইত তাহাতেই খাওয়া-পরা বেশ চলিয়া যাইত। তাহার বেশী আর কোনো প্রয়োজন সে বোধও করিত না।

শ্রীশের টাকার অভাব নাই। দুর্দ্দিনের মধ্যে একটা বিবাহ অবশ্য করিয়াছিল। কিন্তু সে স্ত্রী যে কবে মারা গিয়াছে এখন

আর ভালো করিয়া মনেও পড়ে না। তার পরে ব্যবসার চাপে আর বিবাহ করিবার বোধ হয় সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই।

এদিকে যৌবনেও ভাটা পড়িতেছে।

দু'টি নিরীহ বন্ধু। ডেবিট-ক্রেডিট মিলাইতে মিলাইতে এক-জনের চোখের দৃষ্টি নিস্প্রভ হইয়া আসিয়াছে, ঘাড়টা লম্বা হইয়া সুমুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং শীর্ণ দেহখানি ধনুকের মতো বেঁকিয়া গিয়াছে। আর একজনের বোধ হয় অর্থ লালসাতেই পুরু পুরু ঠোঁটের দুইটা কোণ নীচের দিকে ঝুলিয়া গিয়াছে এবং চোখের নীচেটায় পুঁটুলির মতো মাংস জমিয়াছে।

মনে হয়, যেন মজিয়া যাওয়া কচুরি পানায় ভরা দুটি নদী বিধির বিধানে এক জায়গায় আসিয়া মিশিয়াছে, কোনোটিতেই স্রোত খেলে না।

সন্ধ্যা ছয়টা বাজিতেই শ্রীশ বাহিরের ঘরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকে। আধঘণ্টা পরেই বাহিরে চটি জুতার এবং দরজার কাছে খুক করিয়া একটু কাশির আওয়াজ হয়। অমনি একটুখানি তাকিয়া ছাড়িয়া শ্রীশ বলে, এসো। দুজনের মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়া ওঠে। তারপরে আর একটা হুঁকায় সুরেশের জন্য তামাক আসে। কোনো দিন হয়তো কথা হয়, কোনোদিন হয় না। নিঃশব্দে দুজনে নয়টা পর্য্যন্ত তামাক টানিয়া যায়। তার পর আবার একটু কাশিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়ায়।

শ্রীশ একটু মুখ ফিরাইয়া বলে, উঠলে? এ কথার কোনো উত্তর দিবার প্রয়োজন হয় না। সুরেশ যেমন ভাবে আসিয়াছিল তেমনি ভাবে চলিয়া যায়।

দশ বৎসর ধরিয়া এমনি চলিয়া আসিয়াছে। কথা থাকে না, অথচ দুটি বন্ধুতে এই সময়টায় এই ঘরে একবার করিয়া বসা চাই।

কিন্তু, দশ বৎসরের প্রথা একদিন অকস্মাৎ বদলাইয়া গেল। নীরব আড্ডাটি একদিন সুরেশের রোগশয্যার পাশে উঠিয়া আসিল।

আপিস হইতে শ্রীশ বরাবর সুরেশের ঘরে গিয়া বসে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে সুরেশ একবার দুটি সকরুণ ম্লান চোখ তুলিয়া তাহার পানে চায়। তারপর নয়টা পর্যন্ত একজন নিঃশব্দে বসিয়া থাকে, আর-একজন পাশ ফিরিয়া শুইয়া থাকে।

একদিন হঠাৎ রোগ বাড়িয়া উঠিল। বাকরোধ হইয়া ঘণ্টা কয়েক ছট্‌ফট্ করিয়া সুরেশ চোখ বুজিল, আর মেলিল না।

অনাথা বিধবার মাথা গুঁজিবার কোনো জায়গা রহিল না। শ্রীশের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

নাম কমলা, বছর ত্রিশেক বয়স।

এক ধরণের লোক আছে, শোক যাহাদের বেশীক্ষণ অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে না। প্রথম ঝড়টা কাটিয়া গেলেই ইহারা নিজেদের গুছাইয়া লইয়া আবার দিনের কাজে মন দিতে পারে। কমলা তেমনি মেয়ে।

আসিয়াই দেখিল মস্ত বড় বাড়ী, কিন্তু তেতলা হইতে নীচে পর্য্যন্ত সমস্ত বিশৃঙ্খল। চাকর কতকগুলা আছে বটে, কিন্তু তাহারা কাজের চেয়ে অকাজেই বেশী পারদর্শী।

কোমরে কাপড় জড়াইয়া কমলা ঘরগুলা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল।

দেখিল, নিরীহ ভালোমানুষ পাইয়া চাকরগুলা সর্ব্ববিষয়েই শ্রীশের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। সকালের জলখাবার হয় তো দিতে ভুলিয়াই গেল। বিছানার চাদরটা নোংরা হইয়া গিয়াছে, বদলাইবার কথা কাহারও মনেই হয় নাই। জল চাহিলে হয়তো তিনঘণ্টা পরে পায়, নয়তো পায়ই না। কমলা এদিকে দৃষ্টি দিল।

অনাথিনীর মনও শ্রীশের উপর করুণায় ভরিয়া উঠিল।

এতদিন সদর-অন্দর ভেদ ছিল না। এখন অন্দর বলিয়া একটা বস্তু হইয়াছে। শ্রীশেরও হুট্ করিয়া যখন তখন বাড়ীর ভিতর যাওয়া চলে না।

মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের শাসন ও অনুযোগ বাহির হইতেও শোনা যায়।

চাকরগুলা অকস্মাৎ দয়ার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। ডাকিবামাত্রই হাজির হয়। প্রয়োজনীয় জিনিষ চাহিবামাত্রই পাওয়া যায়।

কি তাহার প্রিয়, ঠাকুরটা কি করিয়া এতদিনে যেন তাহা টের পাইয়াছে। মাঝে মাঝে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভাবে, এই জিনিষটাই যে সে মনে মনে চাহিতেছিল, উৎকলবাসী তাহা বুঝিল কিরূপে!

তবু খাইতে বসিয়া তাহার লজ্জা করে, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। শুধু মনে হয়, কাছেই কোথাও দুইটি দীর্ঘপক্ষ্ম আঁখি স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে।

ক্রমে তাহাও সহ্য হইয়া গেল।

ক্রমে দ্বারান্তরালে দীর্ঘপক্ষ্ম আঁখির অনুমান করার প্রয়োজন হইত না। আস্ত মানুষটিকেই চলিতে-ফিরিতে দেখা যাইত।

এক বাড়ীতে থাকিতে গেলে অত লজ্জা চলে না।

দশটা বাজিতেই চাকর আসিয়া স্নানের তাগিদ দিয়া যায়। উঠিতে দেরী হইলে ভিতর হইতে শাসন শোনা যায়,—কি করছেন

কি শুনি? দশটা বেজে গেছে কখন, এখনও নাওয়া নেই খাওয়া নেই...

আপিসের হিসাব দেখা আর হয় না। আস্তে আস্তে পাতা পত্র গুটাইয়া উঠিয়া পড়িতে হয়।

স্নানের ঘরে দুইটা জায়গায় গরম ও ঠাণ্ডা জল থাকে। চাকরে পরিমাণ মত মিশাইয়া দেয়।

ভাঙা চিরুণীটার জায়গায় ভালো চিরুণী আসিয়াছে। নূতন ব্রাশ। আয়নার উপরে ধূলা জমিয়া থাকে না আর।

হাওয়া একেবারে বদলাইয়া গেছে।

শ্রীশের সাহসও একটু বাড়িয়াছে। খাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করে, পান কোথায়?

উত্তর আসে, ঠাকুর, বলতো, শোবার ঘরে তেপায়ার ওপর আছে।

ঠাকুরের বলিবার দরকার হয় না। কথা এমনিতেই শ্রীশের কাণে পৌঁছায়।

হয়তো জিজ্ঞাসা করে, আমার পকেটে কতকগুলো দরকারী কাগজ ছিল যে।

কমলা চাবির গোছার শব্দ করিয়া ঘরে আসিয়া দেরাজ খুলিয়া কাগজগুল্য বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দেয়। একটু অপেক্ষাও করে, ঐগুলাই কি না জানিতে।

এখন দশমীর রাত্রে শ্রীশ ঠুকঠুক করিতে করিতে এক সময়

আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে, দশমীর খাবারের আয়োজন হইয়াছে কিনা।

পাশের ঘরে কমলা লজ্জায় জিভ কাটে।

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে শ্রীশ কতকগুলা জামা কাপড় আনিয়া টেবিলের উপর ধূপ করিয়া ফেলিল। বলিল, কাপড়গুলো নিয়ে যাও।

প্রথম প্রথম শ্রীশের দেওয়া জিনিষ লইতে লজ্জায় কমলার মাথা কাটা যাইত। চোখের কোণে দু'বিন্দু অশ্রুও জমিত। মনে হইত, তাহার কেহ নাই বলিয়াই পরের দয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে।

এখন কুণ্ঠা গিয়াছে, তবু লজ্জা ঘোচে নাই। নূতন কাপড় কয়খানা দেখিয়া স্মরণ হইল কাল যে ছেঁড়া কাপড়খানি শুকাইতেছিল তাহা শ্রীশের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সেই লজ্জা লুকাইতে কতকটা চঞ্চল পদেই বাহির হইয়া গেল। একটু হাসিও আসিল।

ইতিমধ্যে একদিন শ্রীশ মিস্ত্রী আনিয়া কমলার ঘরে একটা পাখা লাগাইয়া দিয়া গেছে। সেদিন কমলা কতকটা বিরক্ত হইয়াই বলিয়াছিল,—পাখা আবার কি হবে?

কথা কহার অভ্যাস শ্রীশের বড় নাই। কিন্তু সেদিন বোধ হয়

আনন্দের আতিশয্যে একটা রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছিল। বলিয়াছিল,—ফ্যানে যা হয়, তাই হবে।

কমলা এ উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিল,—আমার পাখার দরকার নেই।

শ্রীশ কতকটা আবদারের সুরেই বলিয়াছিল, না নেই।

কথা শ্রীশ আজও বেশী কয় না। কিন্তু এই মৌনী ব্যক্তিটির দৃষ্টি কমলাকেই কেন্দ্র করিয়া যে অহরহ ঘুরিতেছে, তাহাই ভাবিয়া চা তৈরী করিতে করিতে কমলার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

মাঝে মাঝে তাহার বিরক্তিও লাগে। ভাবে, যে দিকে দু' চোখ যায় পলাইয়া গিয়া বাঁচিবে। অথচ এই শিশুর মতো অসহায় এবং সন্ন্যাসীর মত সংযতবাক্ লোকটির উপর কেমন একটা মমতা হয়,—শ্রদ্ধাও জাগে।

ঝড়ের মতো উচ্ছৃঙ্খল বেগে যে আঘাত করিতে আসে, তাহাকে প্রতিঘাত করিবার শক্তির অভাব নাই। কিন্তু যে আঘাত করে না, সান্নিধ্যলাভের প্রয়াস পায় না, এমন কি কথাও কয় না তাহাকে ঠেকাইবার উপায় সে খুঁজিয়া পায় না। এবং তাহারই জন্য কমলার অস্বস্তিরও অন্ত নাই।

ইহারই কিছুদিন পরে শ্রীশ একদিন আফিস হইতে আসিয়া বুঝিল, ভিতরে কিছু একটা গোলযোগ হইয়াছে। কয়দিন হইতে সংবাদ পাইতেছিল, কমলার শরীর ভাল নাই। বাড়ীর ভিতরে গিয়া বুঝিল, আজ কমলাকে শয্যা লইতে হইয়াছে।

একটা অজানিত আশঙ্কায় তাহার বুকটা কেমন করিয়া উঠিল।

আস্তে আস্তে দোরের আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—অসুখ কি বেশী হয়েছে?

উত্তর আসিল না—উত্তর আসিবার কথাও নয়। কিন্তু ইহাতেই অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে, জ্বর একটু বেশী হইয়াছে।

ডাক্তার আনা হইল। নাড়ি টিপিয়া, জিভ দেখিয়া, বুকে ষ্টেথোস্কোপ বসাইয়া এবং গুটিকতক প্রশ্ন করিয়া তিনি একটা দুর্ব্বোধ্য লাটিন রোগের নাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

মুস্কিল হইল শ্রীশের। পাশের ঘরে নির্ব্বিকার ভাবে রোগিণীর অস্ফুট যন্ত্রনাধ্বনিও শোনা যায় না, শ্লথ-বসনা রোগাতুরার শয্যা পার্শ্বে যাইতেও সঙ্কোচ হয়। সমস্ত রাত্রি গভীরতর যন্ত্রণায় বিছানায় পড়িয়া ছটফট করে।

একদিন রাত্রে অকস্মাৎ রোগিণীর ঘরে গেল, এবং মাতা যেমন অসঙ্কোচে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মাথা কোলের উপর তুলিয়া লয়, তেমনি অসঙ্কোচে কমলার মাথা টিপিতে বসিয়া গেল।

মাথার যন্ত্রণাই কমলার বেশী।

তারপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত রোগিণীর শয়ন শিয়রে বসিয়া থাকে। ঔষধ এবং পথ্য দেয়, শুশ্রূষা করে। কমলা যন্ত্রনায় কখনও কাঁদে, কখনও শান্ত হইয়া পড়িয়া থাকে।

ইহার মধ্যে কখন অলক্ষিতে উভয়ের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল।

অসুখও অনেকটা কম পড়িল। কমলা শ্রীশকে রাত জাগিতে নিষেধ করে। তাহার কোলের উপর শীর্ণ, শিথিল বাহু ফেলিয়া দিয়া শান্ত স্বরে বলে, আর রাত জেগো না, যাও।

শ্রীশ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসে, যাইতে পা উঠে না। কমলা ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করার বালাই শ্রীশের কখনই ছিল না। এই প্রথম খোলা জানালা দিয়া যে একটুখানি আকাশের ফালি দেখা যাইতেছিল, কমলার শিয়রে বসিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। কতকগুলা বড় বড় তারা, আটটা কি দশটা, তাহার চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট তারকাবিন্দু, গোণা যায় না।

অকস্মাৎ কমলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার কোলের উপর হইতে হাতটা টানিয়া লইয়া তুইটা ঠেলা দিয়া বলিল, যাওনি শুতে, যাও না, যাও।

রোগে, যন্ত্রনায় এবং শ্রান্তিতে কমলা শিশুর মতো হইয়া গেছে।

এবারে উঠিতে হইল। কিন্তু নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া দ্বারটা বন্ধ করিতেই মনে হইল, কমলা যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, একটু উঃ! শব্দও করিল বুঝি।

আবার আসিয়া কমলার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

ডাক্তার বলিয়া গেছেন, সকাল সন্ধ্যা একটু বাইরে হাওয়া খাওয়ার প্রয়োজন। শ্রীশ দুইবেলা কমলাকে লইয়া মোটরে গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে বাহির হয়।

হাসি-গল্পে রোগিণীর মন প্রফুল্ল রাখা দরকার। তাই রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ছাদের উপর আড্ডা বসে। শ্রীশ গল্প করিতে পারে না, তবু দু'চার কথা বলিবার চেষ্টা করে।

অসুখ হইতে উঠিয়া কমলার বয়স যেন বিশ বছর পিছাইয়া গেছে। দশ বছরের বালিকার মত মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া কথা কয়।

বলিল, আচ্ছা ধ্রুবতারা কোন্‌টা বলত?

শ্রীশ জানে না। যা' তা' একটা দেখাইয়া দিল।

কমলা হাসিয়া উঠিল,—দূর, ওটা কেন? ওটা তো সপ্তর্ষি মণ্ডল। তারপরে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল,—ওইটে, ওইটে, তাও জান না?

শ্রীশ হাসিয়া উঠিল। রাগের ভাণ করিয়া বলিল, না, জানে না। তারপর যেটা মনে আসিল সেই তারাটাকেই দেখাইয়া বলিল —ওইটে মঙ্গল, ওইটে বুধ, এইটে কালপুরুষ, ও ইটা বৃহস্পতি, এইটে অরুন্ধতী।

কমলা মঙ্গল বুধ চেনে না, কিন্তু অরুন্ধতী চেনে এবং তাহার কাহিনীও জানে। এইখানে শ্রীশের চালাকি ধরিয়া ফেলিল। যে আঙ্গুলটা দিয়া শ্রীশ তারা দেখাইতেছিল, সেই আঙ্গুলটা টানিয়া

ধরিয়া হাসিয়া উঠিল,—রক্ষে করুন মশায়, ওটা অরুন্ধতী নয়, ওইটে।

—কক্ষনো না, ওটাই অরুন্ধতী।

কমলা হাসিয়া উঠিল। বলিল, আজ্ঞে না মশায়, ওইটে। আমি বলে কতবার দেখেছি,—বিয়ের সময়...

অকস্মাৎ কমলা গম্ভীর হইয়া উঠিল। একসঙ্গে অনেক কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—বিবাহ, অরুন্ধতী দর্শন, দম্পতি জীবনের অনেক কথা। সবগুলা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল, নীচে নামিয়া গেল।

শ্রীশ বাধা দিল না, কিন্তু ব্যথার চিহ্ন সমস্ত মুখে ফুটিয়া উঠিল। কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলিল।

বহুদিনই কমলা তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছে। কোনো দিনই শ্রীশ বাধা দেয় নাই। বাধা দিবার শক্তি তাহার স্বভাবের বাহিরে। প্রতিদিনই তাহার মুখ শুধু ব্যথায় এমনি বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কমলা তাহা সহ্য করিতে পারে নাই, ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

আজ আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীশ কতক্ষণ অন্যমনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম যখন ভাঙ্গিল, তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া আসিল, কমলার দেখা পাইল না। সকালের খাবার ঠিক সময়ে আসিল, স্নানের তাগিদও। কিন্তু সমস্ত দিন কমলা যেন তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। দ্বারপ্রান্তে চঞ্চল অঞ্চলের প্রান্তটুকুও একবার দেখা গেল না।

আফিস যাইবার পূর্ব্বে শ্রীশ উপর হইতে হাঁকিল, আমার পকেটের কাগজগুলো পাচ্ছিনে যে।

চাকর আসিয়া বলিল, বালিশের নীচে আছে।

খাবার সময় রাত্রে ইচ্ছা করিয়াই কম করিয়া খাইল। ভিতর হইতে কোনো অনুযোগই আসিল না।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীশ আলো জ্বালিয়া হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়া রহিল। শুইতে যাইবার জন্য কেহ তাগিদ দিতে আসিল না।

একবার কমলার দোরে গিয়া কাণ পাতিয়া আসিল। যেন অস্ফুট কান্নার মতো শব্দ পাওয়া গেল, মনে হইল কে যেন অস্ফুটে বলিল,—মা গো! একবার মনে হইল কে যেন নড়া-চড়া করিল। কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া বুঝা গেল না।

তখন অনেক রাত্রি। রাস্তায় লোক চলাচল নাই বলিলেও হয়। ক্বচিৎ একটা মোটর সোঁ করিয়া ছুটিতেছে। দূরে একটা বাড়ীর চারতলার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। শ্রীশের মনে হইল, হয়তো এইমাত্র খোকার কান্নায় উহারা জাগিয়া উঠিল। বোধ হয়, খোকাকে এখন দুধ খাওয়ানো হইতেছে।

শ্রীশ রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কমলার চোখ দুটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ঘুমায় নাই।

খাওয়ার সময় শ্রীশের কাছে বসে নাই। দেখিয়াছে শ্রীশের খাওয়া হয় নাই এবং বাহিরে না গিয়াও বেশ বুঝিয়াছে পাশের ঘরে শ্রীশ আজ ঘুমায় নাই। হয়তো আলো জ্বালিয়া বিছানার উপর বসিয়াই আছে।

সমস্ত রাত্রি ভগবানের কাছে আত্মরক্ষার জন্য শক্তি প্রার্থনা করিয়াছে।

সকালে উঠিয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিতেই দেখিল, শ্রীশ তাহার ঘরের সামনেকার রেলিং ধরিয়া দূরের দিকে চাহিয়া আছে।

কমলা আর পারিল না। তাড়াতাড়ি আবার দোর বন্ধ করিয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

কিছুই তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তবু কোনোরূপে জোর করিয়াই আপিসে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার সমস্ত জীবন নষ্ট করিয়া দিল। আপিসে

দেওয়া-নেওয়া সবই করিল, কিন্তু মোটা মোটা অঙ্কের চেকগুলা তাহার কাছে নিরর্থক মনে হইতে লাগিল। এবং ইহারই পিছনে ছুটিয়া কি করিয়া যে যৌবন ব্যয়িত করিয়া ফেলিল তাহাই তাহার নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইল।

সন্ধ্যার সময় আপিস বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সিঁড়ি বহিয়া তেতলা আসিবার সময় আড়চোখে চারিদিকে একবার চাহিয়াও দেখিল। দেখা মিলিল না।

আপিসের পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে তাহার মনে হইল, কমলার সঙ্গে একবার দেখা করিতেই হইবে। প্রতিদিন এমন করিয়া নীরবে সে অত্যাচার সহিতে পারিবে না।

সব ঘরগুলা খুঁজিতে খুঁজিতে পূজার ঘরে দেখিল কমলা অন্ধকারে প্রণত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

চৌকাঠে ঠেস দিয়া বাহিরে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ একটা ভারি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে চমক ভাঙ্গিল।

কমলা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দোরের দিকে মুখ ফিরাইতেই প্রথমটা চমকাইয়া উঠিল। একটুক্ষণ কি ভাবিয়া লইল। তারপরে কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, কি, বল?

বলিবার অনেক কথাই শ্রীশ ভাবিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলা তাহার একটা হাত ধরিয়া শুষ্কস্বরে অন্যদিকে চাহিয়া

বলিল, এই দু'দিন আমি যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর পারিনে। তোমায় ঠেকিয়ে রাখা আমার অসাধ্য।

শ্রীশ শুধু সেই হাতটিকেই সবলে চাপিয়া ধরিল। তাহার সমস্ত দেহ তখন কাঁপিতেছিল।

বন্ধু-নির্ব্বাচন

অনুপমকে লইয়া অনুপমের মায়ের দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার শেষ নাই।

সাত নয়, পাঁচ নয়, ওই একটিমাত্র ছেলে; তাও যেমন-তেমন ছেলে নয়,—রূপে গুণে সমান। ফুটফুটে রং, লম্বা ছিপ্‌ছিপে দেহ; বছর দুই হইল এম, এ, পাশ করিয়া বসিয়া আছে। বসিয়া আছে, কারণ কিছু না করিলেও চলে। বাপ যে টাকাটা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাহার জীবনে অর্থকষ্ট হইবার কথা নয়।

এমন ছেলের বিবাহ করিতে গা নাই।

মস্ত বড় বাড়ী। নীচের তালার সমস্তটা ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও দোতালায় যে ঘরগুলা আছে তাহারও অর্দ্ধেক তালা-বন্ধই থাকে। বাস করিবার মানুষ কই? বাহিরের দিকে একটা ঘর অনুপমের পড়িবার ঘর। ঘর নয়, হল। বইতে ঠাসা। সেখানাকেই বসিবার ঘর করিলেও চলে। কিন্তু ঘরের অভাব নাই বলিয়া পাশের ঘরখানিকে বসিবার ঘর করা হইয়াছে। তাহার পর হইতে যতগুলি ঘর সবগুলিই দিবারাত্রি বন্ধ থাকে। ও-

দিকের সুদূর প্রান্তে পাশাপাশি দুখানি ঘরে থাকে মা ও ছেলে। তেতালার দুখানি ঘর লইয়া পিসিমার সংসার,—অর্থাৎ একখানি তাঁহার শয়ন-কক্ষ, আর একখানি একাধারে ভাঁড়ার ও রান্নাঘর।

অতি শৈশবে পিসিমার বিবাহ হইয়াছিল। অতি শৈশবেই তিনি বিধবা হন। অনুপমের পিতামহ বিধবা কন্যার জন্য তেতালার ঘর দুখানি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন। পাকাপাকি উইল করিয়া অবশ্য নয়, কিন্তু তিনি জানিতেন তাঁহার মৌখিক আদেশই অনুপমের পিতার পক্ষে যথেষ্ট। এরূপ ব্যবস্থা করিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ একে তো অনুপমের পিতা স্বভাবতঃই স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তা ছাড়া বাঙ্গালী পরিবারে কেহ কোন কালেই বিধবা ভগিনীকে ফেলিতে পারেনা। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ভগিনীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মোটা ভাত মোটা কাপড়টা দেয়। অনুপমের পিতামহ বিধবা কন্যার জন্য একখানি বাড়ীও দিয়া গিয়াছেন। তাহার উপস্বত্ব হইতে পিসিমার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কতকটা এই সকল কারণে এবং কতকটা তাঁহার কলহ-পরায়ণতার জন্য বাড়ীতে পিসিমার প্রভাব অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল। অনুপমের মাতা তাঁহাকে বিলক্ষণ ভয় করিয়া চলিতেন।

কিন্তু এহেন পিসিমাও অনুপমকে বাগ মানাইতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন।

অনুপমের মা এমনিতেই ভালোমানুষ লোক; তাহার উপর বিধবা ননদের অসংখ্য পীড়ন সহিয়া সহিয়া তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, কাহাকেও কোনো কথা জোর করিয়া বলিবার শক্তি নাই। প্রতিবেশিনীরা মাঝে মাঝে এ বাড়ী আসেন। এ বাড়ীর মেয়েরাও প্রতিবেশীদের বাড়ী যাতায়াত করেন। অনুপমের কথা প্রায়ই ওঠে। তা আবার না ওঠে? বাঙ্গালী ঘরের ছেলে—রূপ আছে, অর্থ আছে, বিদ্যা আছে। এমন ছেলে বিবাহ করিবে না, এও আবার একটা কথা?

ঘোষ-গিন্নী অবসর-প্রাপ্ত সাব-জজের স্ত্রী। বুদ্ধিমতী বলিয়া পাড়ায় তাঁহার নাম আছে। তিনি চোখ মট্‌কাইয়া হাসেন; বলেন,—এর মধ্যে আরও কিছু কথা আছে। দাঁড়াও না...

অনুপমের মা এ-কথা শুনিয়া আড়ালে চোখ মোছেন। ছেলেকেও কিছু বলিতে পারেন না, প্রতিবেশীদেরও কিছু বলিতে পারেন না।

কিন্তু পিসিমা ঝঙ্কার দিয়া ওঠেন; বলেন,—তা হতেই বা কতক্ষণ? চোখখাগীদের ধেড়ে ধেড়ে মেয়েরা যে দিনরাত্রি ছাতের ওপর হাঁ ক'রে রয়েছে! চোখখাগীরা আমার ছেলের নিন্দে না ক'রে ঘরের মেয়ে সামলাক।

খবরটা দিতে আসিয়াছিলেন মজুমদার-গিন্নী। তাঁহার বাড়ীটা দূরে নয়। সকল বাড়ীর মতো তাঁহার বাড়ীতেও বিবাহযোগ্যা বড় মেয়ে আছে। এবং কলিকাতা সহরে ছাতই মেয়েদের পার্ক

বলুন, আর গড়ের মাঠ বলুন, সব। পিসিমার কথা শুনিয়া তিনি মুখ আম্‌তা আম্‌তা করিলেন।

অনুপমের মা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—ও আবার কি কথা ঠাকুরঝি?

পিসিমা সেকেলে লোক। পুরুষমানুষের চরিত্রহীনতাকে তিনি দোষের বলিয়াই মনে করেন না। তাই অনুপমের চরিত্র-দোষের ইঙ্গিত নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়া পাল্টা জবাব দিলেন।

পিসিমা বৌকে মুখ ঝাম্‌টা দিয়া বলিলেন,—তুমি থামো তো বৌ। বলবে না, ছেড়ে দেবে!

সেই রাত্রে আহারের সময় দুই ননদ-ভাজে অনুপমের কাছে গিয়া বসিলেন। তাঁহাদের ভিজা বিড়ালের মতো শান্ত ভাব দেখিয়া অনুপম সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

—বড় যে ভব্যিযুক্ত হয়ে বসেছ। কি ব্যাপার বল তো?

পিসিমা কথা কহিলেন। বলিলেন,—ব্যাপার আর কি! আমরা তীর্থে যাব; কিছু টাকা দে দিকি?

—তীর্থে যাবে? কেন এখানে অসুবিধাটা কি হচ্ছে?

—অসুবিধা আবার কি? বুড়ো হয়েছি, তীর্থ-ধর্ম্ম করব না? আজীবন তোর এই নেড়া সংসার আগ্‌লে থাকবো?

অনুপম একটু চিন্তার ভাণ করিয়া বলিল,—তা ঠিক। ফিরতে কত দেরী হবে তোমাদের ?

মা বলিলেন,—আর কি সুখেই বা ফিরবো ? ফিরবো না। নাতী-নাতনী নিয়ে আনন্দ করার সাধ-আহ্লাদ তো নেই।

অনুপম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—এই কথা! তা আমি কি বিয়ে করব না বলেছি ? মেয়ে কই ?

মা অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন,—বিয়ে করব না আবার কাকে বলে! যে মেয়ে আনছি তাই তোর পছন্দ হচ্ছে না।

অনুপম মাথা তুলিয়া বলিল,—ক'টা মেয়ে এনেছ শুনি ? হালদারদের সেই সিরিঙ্গে কালো মেয়েটা। আর···

পিসিমা বলিলেন,—সে না হয় সিরিঙ্গে কালো মেয়ে, কিন্তু রসুলপুরের চৌধুরীদের বাড়ীর অমন মেয়ে···

অনুপম হাসিয়া বলিল,—রক্ষে কর পিসিমা। রসুলপুরের চৌধুরীদের বাড়ীর মেয়ে...

পিসিমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন,—কেন, মন্দই বা কি ? তিনটে পাশ করেছে, গান-বাজনা জানে, দেখতে শুনতেও ভালো। সুপাত্রী আর কাকে বলে ?

অনুপম গলা খাটো করিয়া বলিল,—ও সব মেয়ের গোঁফ বেরুবে আর দুদিন পরে। তোমার সামনে পায়ের ওপর পা দিয়ে চেয়ারে বসে সেই গোঁফে তা দেবে। জানো ?

ছেলের কথা শুনিয়া দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।

এক টুকরা লুচি মুখে পুরিয়া অনুপম বলিল,—গড়ের মাঠে যাবে হকি খেলতে। তাতে তোমরা কোনো কথা বলতে গেলেই দেবে হকি-ষ্টিক দিয়ে মাথা ফাটিয়ে। জানো না তো?

পিসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—না, তুই-ই সব জানিস। পাশ-করা মেয়ে তো আর আমরা দেখি নি! সবাই তারা চেয়ারে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে, আর গড়ের মাঠে হকি খেল্‌ছে। বিয়ে করবি না, তাই বল।

মা শান্ত কণ্ঠে বলিলেন,—আচ্ছা, পাশ-করা মেয়ে বিয়ে না করতে চাস নেই নেই। ঠাকুরঝির দেওরের মেয়েটি তো সুন্দরী। তাকেই বরং দেখে আয়।

—ঠাকুরঝির দেওর! তিনি আবার কে পিসিমা? তাঁর কথা তো কখনও শুনিনি? তোমার আবার দেওর আছেন না কি?

পিসিমা একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—নিজের দেওর নয়, দূর-সম্পর্কের। আমার শ্বশুরের···

সম্পর্কের কথা উঠিলেই অনুপম বিব্রত হইয়া ওঠে। তাড়াতাড়ি বলিল,—বুঝতে পেরেছি। তাঁরই মেয়ে।

পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ। তারপরে বলিলেন, —অমন সুন্দরী মেয়ে আমি তো চোখে দেখি নি। যেমন রূপ, তেমনি গড়ন।

মুগ্ধ হইবার ভান করিয়া অনুপম বলিল,—হুঁ ?

মা কৈফিয়তের সুরে বলিলেন,—তবে তেমন লেখাপড়া জানে না বাপু। পাশ-টাস নয়।

এই সামান্য ত্রুটি ডান হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া অনুপম বলিল,—তা হোক। কিন্তু নাকে নোলক পরে তো ? পায়ে মল ?

আবার দুজনে হাসিয়া উঠিলেন।

পিসিমা আবদারের সুরে বলিলেন,—শোন কথা ছেলের ? আজকাল মেয়েরা আবার নোলক পরে, না মল পরে ?

মা বলিলেন,—তাইতেই তো অমন ধিঙ্গির মতো লাগে। আমার তো বাপু নোলক-পরা মেয়ের মুখ ভারি মিষ্টি লাগে। কালে-কালে কীই যে হচ্চে !

গম্ভীর ভাবে অনুপম বলিল,—সেই দুঃখেই তো বিয়ে করতে মন হয় না মা।

মা হাসিয়া বলিলেন,—তোর আর দুঃখ ক'রে কাজ নেই বাছা। যে কালের যা। তুই একটা বিয়ে করলেই আমরা কৃতার্থ হই। আমাদের দিন তো শেষ হ'য়ে এল। এখন যে ক'টা দিন আছি…

মা আঁচলে চোখ মুছিলেন।

দিন পনেরো পরে পিসিমার দেওর রামসদয়বাবু কন্যাসহ এ বাটিতে পদার্পণ করিলেন। মা মেয়েটিকে বুকে করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। আর পিসিমা বসিলেন দেবরের সঙ্গে গল্প করিতে। কতকাল দেখা নাই, গল্প যেন আর ফুরাইতে চায় না।

রামসদয়বাবু শিমলায় বড়লাটের দপ্তরে বড় চাকুরী করেন। মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করিবার জন্য লম্বা ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছেন, মনে করিয়া মনে করিয়া সকলকেই মেয়ের জন্য একটি সুপাত্র দেখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। মেয়েটিকে পিসিমা ছোটবেলায় একবার দেখিয়াছিলেন। তখন মেয়েটির বয়স আট কি নয়। এতদিন পরে তাহা স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মনে পড়িবার কথা নয়। কিন্তু এ কথা বেশ মনে ছিল যে, মেয়েটি সুন্দরী। বিশেষ করিয়া তাঁহার মনে হইল, সে যদি তাহার মায়ের রূপের কিছু অংশেরও অধিকারী হয়, তাহা হইলেও অনুপমের তাহাকে অপছন্দ হইবে না। সেই ধারণার বশেই তিনি রামসদয়বাবুকে পত্রপাঠ একদিন মেয়ে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; এবং সেই পত্র পাইয়াই রামসদয়ের আবির্ভাব।

দীর্ঘ দিন কেরাণীগিরি করিলে যাহা হয়, রামসদয়বাবুরও তাহাই হইয়াছে,—অর্থাৎ কিছু অপ্রয়োজনীয় মেদ ও ডিসপেপ্‌সিয়া। কিন্তু মনটি তাঁহার বড় সাদা। মাসের পর মাস নিয়মিত মাহিনা পাইয়াছেন, তাহাতে সংসার-খরচ চালাইয়াও কিছু বাঁচিত। সেই

টাকাটা মাসে মাসে যায় ব্যাঙ্কে। এখন তাহা ফুলিয়া ফাঁপিয়া বেশ মোটা অঙ্কে দাঁড়াইয়াছে। মনটিও তাই সাদাই আছে। কেবল ইদানী গৃহিণীর তাড়ায় একটা দুর্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কিন্তু সেও টাকার নয়, পাত্রের।

রামসদয় টিপ্ করিয়া পিসিমার পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিয়া বলিলেন,—এই নিন আপনার মেয়ে বৌদি। ওকে আপনার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে গেলাম। যা হয় ক'রবেন। আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই।

বলিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া ঘর ফাটাইয়া দিলেন।

কিন্তু তখনই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—বাবাজি কোথায়?

পিসিমা কপালের কাছ অবধি ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া বলিলেন,—কোথায় গেছে। আসবে এখুনি। লাফিও না, স্থির হয়ে ব'স দেখি।

বসিতে বসিতে অপ্রস্তুতভাবে রামসদয় বলিলেন,—ওই একটা ভারী বদ অভ্যেস হ'য়ে গেছে বৌদি। ওই হাসিটা...ভাগ্যিস বাবাজি নেই...তাহ'লেই...

দরজার গোড়ায় কপাটে ঠেস দিয়া বসিয়া পিসিমা বলিলেন,—বাড়ীর খবর বল। বৌ কেমন আছে? ছেলেরা?

রামসদয় তখনও বোধ হয় হাসির অপরাধের কথাই ভাবিতেছিলেন; অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—ভালোই।

—বোএর সেই বুকের ব্যথাটা সেরেছে ?

—না, সারে নি।

পিসিমা ঠোঁট টিপিয়া হাসিলেন। বলিলেন,—তাহ'লে আর ভালো কি ক'রে বলছ ?

রামসদয় তেমনি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—না, ভালো বলা যায় না।

পিসিমা হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন,—তুমি ঠিক তেমনি আছ, ঠাকুরপো। তেমনি বোকা-বোকা, মন-ভোলা। তবে যে শুনি, তুমি নাকি মস্ত বড় চাকরী কর, অনেক টাকা মাইনে ?

রামসদয় একবার একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন ; বলিলেন,—কি জানি, কি বলতে কি বলেছি। আমার মনটা বড় ভালো নেই। মেয়ের বিয়ের চিন্তায়...

ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়ের বয়স আঠারো-উনিশের কম নয়।

পিসিমা বলিলেন, এত দিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে ?

—ঘুমোই নি বৌদি। দেশে এসে দুদিন জির[illegible] যে মেয়ের একটা সম্বন্ধ করব তার ছুটি পাচ্ছিলাম না। অব[illegible]...

পিসিমা নতমুখে ইঙ্গিতপূর্ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—যাক্ গে, সে ভালোই হয়েছে।

সে হাসির অর্থ রামসদয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না ; বিস্মিত-ভাবে বলিলেন,—কেন বলুন তো ?

পিসিমা একবার তাঁহার দিকে স্মিতহাস্যে চাহিয়া বলিলেন,—অমনি একটি ফুট্‌ফুটে বৌএর আমাদের দরকার ছিল।

এমন সুন্দর মেয়েকে যে অনুপম পছন্দ না করিয়া পারিবে না, এ বিষয়ে পিসিমা নিঃসন্দেহ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বলিলেন,—একটু বোসো। আমি আসছি।

পাশের ঘরে গিয়া দেখেন মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া অনুপমের মা খাটের উপর বসিয়া আছেন; আর তাঁহার দু চোখে জলের ধারা নামিয়াছে।

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন,—ও কি বৌ, এখন থেকেই অতটা ভালো নয়।

অনুপমের মা হাসিয়া চোখ মুছিলেন। বলিলেন,—বেয়াইএর জলখাবার, ঠাকুরঝি?

পিসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি যা করছ, তাই কর।

বলিয়া মেয়েটির কাণদুটি ঢাকিয়া যে দুই গুচ্ছ চুল পড়িয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে তুলিয়া দিলেন। মেয়েটি কেশগুচ্ছ যথাস্থানে রাখিবার জন্য একবার আত্মবিস্মৃতভাবে হাত তুলিয়াই আবার নামাইয়া লইল।

অনুপমের মা বলিলেন,—ও কি ঠাকুরঝি! কাণের ওখানকার চুলগুলো তুলে দিলেন কেন? বেশ তো ছিল। ওই যে এখনকার ফ্যাশান। এ কি আপনাদের সময় পেয়েছেন?

পিসিমা অপ্রস্তুত ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—তাই নাকি? তবে বাছা, যেমন ছিল তেমনি ক'রে নাও। আমার অনুপম আবার...

পিসিমা আর দাঁড়াইলেন না। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

মেয়েটিকে অনুপমের মায়ের খুবই পছন্দ হইয়াছে। যেমন পরীর মতো রূপ, তেমনি নরম-সরম স্বভাব। এ কালের মেয়েরা যে এমন শান্ত এবং লাজুক হয়, তাহা তাঁহার ধারণাতেই ছিল না। মেয়েটির উপর এক মুহূর্ত্তে যেন কেমন মায়া পড়িয়া গিয়াছে। মনে হইল, এখন হইতেই সে যদি তাঁহার কাছে থাকিয়া যায় তো বেশ হয়। তাঁহার কেমন মনে হইল, গৌরীর মতো এই মেয়েটি যেন তাঁহার পাগ্লা ছেলের জন্যই এতকাল তপস্যা করিতেছিল।

পিসিমা নিজের হাতে জলখাবার লইয়া আসিলেন। ঝি আসিয়া মেঝেয় আসন পাতিয়া দিয়া গেল। অনুপমের মা বুকে করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া মেয়েটিকে আসনে নিয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়ে বড় লাজুক, কিছুতেই হাত বাহির করে না। মা নিজের হাতে একটি একটি করিয়া ফল, মিষ্টান্ন তাহার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন।

—লজ্জা কি মা? আমাকে কি লজ্জা করতে আছে? তোমার বাড়ীতে যেমন একটি মা আছেন, আমিও তেমনি মা। আমাকে লজ্জা করতে নেই। বুঝলে?

কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল, পাগ্‌লা ছেলের ফেরার নাম নাই। সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পছন্দ হইয়াছে বটে। কিন্তু ছেলেকে না দেখাইয়া তো কথা দেওয়া যায় না।

পিসিমা বলিলেন,—তোমাদের তাহ'লে আজ রাত্রে থেকে যেতে হচ্ছে ঠাকুরপো। অনু তো এখনও ফিরলো না।

রামসদয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—তাহ'লে খুকু বরং থাক। কিন্তু আমি কি ক'রে থাকি? জানেনই তো আপনার বোনকে!

বলিয়া আর এক দফা উচ্চহাস্য করিয়াই মধ্যপথে থামিয়া গেলেন। সভয়ে বলিলেন,—দেখছেন?

দ্বারের অন্তরাল হইতে অনুপমের মা অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—বেয়ান বুঝি···

তাড়াতাড়ি রামসদয় বলিলেন,—সে বৌদিকে জিগ্যেস করবেন। উনি সব জানেন।

রামসদয়বাবু নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কি কথা মনে পড়ায় তখনই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—বেয়ানের কথা বলছেন? তাহ'লে একদিনের ঘটনা শুনুন।

কিন্তু তখনই স্মরণ হইল, ঘরের মধ্যে কন্যা আছে। আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, সে থাক। পরে বলব। তাহ'লে খুকু রইল বৌদি।

রামসদয়বাবু চলিয়া গেলেন।

রামসদয়বাবু চলিয়া যাওয়ার আধঘণ্টা পরেই অনুপম আসিল। বৃষ্টিতে তাহার জামা-কাপড় ভিজিয়া সপ্‌সপ্‌ করিতেছে।

মা তাহার রকম দেখিয়া গালে হাত দিলেন। বলিলেন,—ভিজ্‌লি কোথায় রে? কাপড় ছাড়্‌ শীগগির। ওরে ও রামধন, বাবুর জন্যে কাপড় নিয়ে আয় তো একখানা।

জামা কাপড় বদলাইয়া সুস্থ হইয়া বসিয়া অনুপম বলিল,—আজ যা বৃষ্টিটা মাথার ওপর দিয়ে গেছে মা। উঃ! মুষলধারে বৃষ্টি!

—তখন কি তুই রাস্তায়?

বীরত্বের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে অনুপম বলিল,—আবার কোথায়?

তারপরে সকাতরে বলিল,—একটু চা দিতে পারো মা? ঠাণ্ডায় শরীরটা জমে গেছে।

বলিয়া হাতে হাত ঘসিতে লাগিল।

মা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, দিচ্ছি এনে।

অনুপম একটা বই খুলিয়া পড়িতে বসিল। বই পড়াটা তাহার বাতিক। পরীক্ষা পাশ করার পরেও এই অভ্যাসটা সে ছাড়ে নাই। তা ছাড়া করিবেই বা কি? কাজ তো কিছুই নাই! মাসের পর মাস ইংরাজি পুস্তকের দোকান হইতে তাহার নামে গাদা গাদা বই আসে। সকাল-সন্ধ্যা সেইগুলি লইয়াই তাহার দিন কাটে,—এবং ভালোই কাটে।

হাতের কাছের বইখানি টানিয়া লইয়া সে একমনে পড়িতেছিল। অবশ্যই এক মনে পড়িতেছিল। নহিলে বাহিরে অতগুলি লোকের পদশব্দ এবং দ্বারপ্রান্তের নারীমূর্ত্তি নিশ্চয়ই তাহার চোখে পড়িত। কিন্তু কিছুই চোখে পড়িল না। সে যেমন বই পড়িতেছিল তেমনি পড়িতে লাগিল।

এদিকে খুকুর ডান হাতে চায়ের বাটি, বাঁ হাতে খাবারের রেকাবী। দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ঘামিয়া উঠিল। অথচ যাহার জন্য এই সমস্ত আনা সে চাহিয়াও দেখে না, কথাও বলে না। কিন্তু মা ও পিসিমার নিঃশব্দ তর্জ্জনে সে দাঁড়াইয়াও থাকিতে পারে না। তাঁহারা ক্রমাগত ভিতরে যাওয়ার জন্য তাড়া দেন। এমনি অবস্থায় কোনো রকমে কম্পিত পা দুটিকে টানিয়া সে টেবিলের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

এতক্ষণে তাহার উপর অনুপমের দৃষ্টি পড়িল। অনুপম বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এবং তাহার চোখে চোখ না ফেলিয়াও খুকু তাহার বিস্মিত দৃষ্টি যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

অনুপমের মা তাহাকে একখানি লাল বেনারসী পরাইয়া দিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিয়াছেন নানা আভরণ। সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা খুকুকে রাজকন্যার মতো চমৎকার দেখাইতেছিল।

খুকুর সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে ও লজ্জায় থরথর করিয়া কাঁপিতে ছিল। চায়ের বাটি টেবিলের উপর রাখিতে গিয়া খানিকটা চা চল্‌কিয়া

টেবিলে, খোলা বইখানিতে এবং সেখান হইতে অনুপমের জামা-কাপড়ে পড়িয়া গেল। অনুপম হাঁ হাঁ করিয়া উঠিতেই খুকুর বাঁ হাতের খাবারের থালাটিও ঝন্ ঝন্ করিয়া টেবিলের উপর পড়িয়া গেল। খাবারগুলা ছড়াইয়া পড়িল না বটে, কিন্তু সমস্ত মিলিয়া সে একটা কাণ্ড!

জামা-কাপড় হইতে চায়ের জল ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য অনুপম তখন চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে! তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিয়াছে। অপরিচিতার সম্মুখে যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে?

এ প্রশ্নের কি উত্তর সে দিবে? খুকু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যত কাঁপে, তত ঘামে। ব্যাপার দেখিয়া অনুপমের মা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া খুকুকে বাহিরে লইয়া গেলেন।

—এ মেয়েটি কে, মা?

মা হাসি চাপিয়া বলিলেন,—কে আবার! ঠাকুরঝির দেওরের যে মেয়েটির কথা সেদিন বলছিলাম না? সেই। বেশ মেয়েটি, না?

অনুপম হাসিয়া বলিল,—দিব্যি মেয়ে।

তারপরে টেবিলের ঢাকার পানে চাহিয়া বলিল,—ঢাকাটা না হয় ধোপার বাড়ী দিলেই হবে। চায়ের জল ফেলে আমাকে যে পুড়িয়ে দেয়নি এই যথেষ্ট। কি বলো?

মা রাগিয়া বলিলেন,—তা অজানা বেটাছেলের সামনে ভয় হবে না? ও আমার একালের মেয়ের মতো তো নয়।

পুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া যথাসাধ্য বিরক্তি গোপন করিয়া অনুপম সংক্ষেপে কহিল,—তা ঠিক।

মা সোল্লাসে বলিলেন,—তাহ'লে এই সম্বন্ধই ঠিক করি?

অনুপম চেয়ারটা ঘুরাইয়া মায়ের দিকে সুমুখ ফিরিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—না।

ছেলের সে কণ্ঠস্বরে মা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন।

তারপরে কি একটা বলিতে যাইতেই অনুপম রুক্ষকণ্ঠে বলিল,—তুমি কিছু বোঝ না কেন, মা? এক কাপ চা দিতে গিয়ে যে একটা টেবিলের ঢাকা, একখানা জামা, একটা কাপড় নষ্ট করে,—মানুষ পুড়ে মরতে মরতে বেঁচে যায়, সে মেয়ে নিয়ে আমি কী করব?

—তা নতুন জায়গায় এলে...

ছেলে আবার কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—নতুন পুরোনো জানি নে মা, এই ধরণের ন্যাকা মেয়ে আমার দুচক্ষের বিষ। রূপ...রূপ...রূপ—শুধু রূপ নিয়ে আমি ধুয়ে খাবো!

মা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিলেন। অনুপম বইখানির যে জায়গায় চা পড়িয়াছিল সেই জায়গায় ব্লটিং দিয়া শুকাইতে চেষ্টা করিল। এ বিবাহ ভাঙিয়া গেল। একদিকে মা ও পিসিমা, অপরদিকে ছেলে একা। কয়দিন উভয় পক্ষে কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিল। কিন্তু মায়ে-ছেলেয় কত দিন কথা বন্ধ

থাকিতে পারে? তিন দিন, কি চার দিন। তারপরে সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল।

ইহার দিন কয়েক পরে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল :

ক্যালকাটার সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা। দর্শক ও উপদর্শকের ভিড়ে তিল ধরিবার ঠাঁই নাই। গাছের শাখায় মানুষ বাদুড়ের মতো ঝুলিতেছে। 'র‍্যাম্পার্টে' কতকগুলো লোক ঠেলাঠেলি করিতেছে। কয়েকটা লোক কাঠের ডগায় আয়না বাঁধিয়া নূতন কৌশলে খেলা দেখিতেছে। ভিতরের অবস্থাও বর্ণনার অতীত। এবং এই ভিড়ে শুধু পুরুষ নয়, বহু মহিলারও সমাগম হইয়াছে।

হঠাৎ এদিক হইতে চীৎকার উঠিল, 'গোল' 'গোল', এবং ওদিক হইতে তাহার পাল্টা চীৎকার উঠিল, 'নট্ গোল' 'নট্ গোল'। ছাতায়, টুপিতে, জুতায়, রুমালে মাথার উপরকার আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিল। গোলমাল শান্ত হইলে দেখা গেল, গোল নয়, রেফারী গোল দেয় নাই। এত বড় অন্যায় জাতীয় পক্ষ নীরবে সহ্য করিতে পারে না। আবার চীৎকার উঠিল, অশ্রাব্য কটু কথা, হিন্দী-বাংলা-ইংরাজির অবিশ্রান্ত বাক্য-নির্ঝর। কিন্তু তাহাতেই শেষ হইল না। একদল চেঁচাইয়া উঠিল, মার রেফারীকে। দেখিতে দেখিতে দর্শকের দল আসন ছাড়িয়া পিল্ পিল্ করিয়া

খেলার মাঠ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। খেলা বন্ধ হইয়া গেল। সেই জনস্রোতে কে রেফারী আর কে রেফারী নয়, ঠিক করা কঠিন। অধিকতর উৎসাহী দল ইতিমধ্যে গ্যালারীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। কাহার মোটর ঠিক নাই, যে পারে নিকটবর্ত্তী মোটরের ট্যাঙ্ক হইতে পেট্রল আনিয়া গ্যালারীর বেঞ্চে ঢালে, আর দেশলাই জ্বালাইয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একদল সোয়ারী পুলিস ও সৈন্য আসিয়া খেলার মাঠে ছুটিয়া ছুটিয়া এলোপাথারী ব্যাটন চালাইতে লাগিল। সেই ব্যাটনের মুখে বাঙালী বীর তিষ্ঠিতে পারিল না। যে যে-দিকে পারিল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। তাহাতেও নিস্তার নাই। সোয়ারী পুলিস পিছু ছাড়ে না।

অনুপম প্রথমে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল পশ্চিম দিকে। কিন্তু সোয়ারী পুলিসের তাড়ায় সেদিক হইতে দক্ষিণে, তারপরে পূর্ব্বে এবং অবশেষে উত্তর দিক ঘুরিয়া যখন আবার পশ্চিমে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল একটি মেয়ে সাঁকোর কাঠের রেলিঙে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল না। শুধু ঘাড়ের উপর ফাঁপানো কবরীটি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তখন গোলযোগ অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। সোয়ারী পুলিস লোক তাড়া করা ছাড়িয়া খেলার মাঠের আগুন নিবাইতে মনোনিবেশ করিয়াছে।

একলা মাঠে একটি মেয়েকে এমন করিয়া কাঁদিতে দেখিয়া অনুপমের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় তাহাকে ডাকা সঙ্গত হইবে কি না স্থির করিতে পারিল না। মনে হইল সঙ্গত হইবে না। যে কারণেই মেয়েটি কাঁদুক তাহার সহিত কি সংস্রব!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনো বাধাই টিকিল না। অনুপম তাহার পাশে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল,—শুনুন, শুনছেন?

মেয়েটি চমকিয়া জল-ছলছল চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। পরক্ষণেই দৃষ্টি নত করিল।

কালো মেয়ে। তন্বী। বড় বড় ক্লান্ত চোখ। মুখখানি কতকটা অশ্রু-স্নানে, কতকটা অস্তরবির আভায় বড় করুণ, বড় কোমল, বড় মিষ্টি লাগিতেছিল।

অনুপম অজ্ঞাতসারেই আরও একটু সরিয়া আসিল। কোমল কণ্ঠে কহিল,—আপনার কি হয়েছে আমাকে বলবেন? আপনি কি খেলার মাঠে গিয়েছিলেন?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

—আপনি কি হারিয়ে গেছেন? কি হ'য়েছে আপনার? সঙ্গের লোকদের খুঁজে পাচ্ছেন না?

মেয়েটি কোনো রকমে আর একবার সায় দিয়াই অশ্রুরোধ করিবার জন্য মুখে আঁচল-চাপা দিল।

মেয়েটির দুঃখে অনুপমের মন গলিয়া গেল।

কহিল,—তা, এখানে দাঁড়িয়ে তো লাভ নেই। সন্ধ্যেও হয়ে আসছে। যদি বিশ্বাস করেন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। তাই করবেন?

মেয়েটি আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—আমার গলার হার?

—হার? কি হ'ল? হারিয়ে গেছে? খেলার মাঠেই বোধ হয়...

অনুপম হতাশভাবে একবার খেলার মাঠের দিকে চাহিল। বাহিরের লোক আর সেখানে কেহ নাই। কয়েকজন লোক, বোধ হয় মাঠের কর্ত্তৃপক্ষই হইবে, আর বহু গোরা ও পুলিশ বীরদর্পে মাঠের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মেয়েটির জন্যও সেখানে যাইতে অনুপমের সাহস হইল না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে শুধু একবার বলিল,—তাই তো।

তারপরে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিল,—দেখুন, ওখানে যাওয়া এখন মানুষের অসাধ্য। সুতরাং হারের জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। ও আর পাওয়াও যাবে না। তার চেয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখন বাড়ী ফিরে যাওয়া দরকার। বুঝলেন? আপনার জন্যে বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই ভাবছেন।

মেয়েটিও সে কথা বুঝিল। বলিল,—চলুন।

ট্রামের রাস্তা একটু দূরে। চলিতে চলিতে অনুপম জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কি প্রায়ই খেলা দেখতে আসেন?

—মাঝে মাঝে।

অনুপমের মুখে আসিতেছিল,—অন্যায় করেন।

কিন্তু মেয়েটির উপর কেমন যেন মমতা হইতেছিল। মনে মনে বলিল,—তা, এমন অন্যায়ই বা কি? মেয়ে মানুষ হওয়াটা কি এমনই অপরাধ যে, এমন চমৎকার খেলাও দেখিতে পাইবে না?

খানিক পরে অনুপম আবার জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি পড়েন বোধ করি?

মেয়েটি সায় দিল,—হ্যাঁ।

—কলেজে?

—হ্যাঁ, থার্ড ইয়ারে।

—আপনি কার সঙ্গে এসেছিলেন? আপনার বাড়ীর কারও সঙ্গে?

—আমার দাদার সঙ্গে।

আহা, বেচারা দাদা! বোনের জন্য সে যে এখন কোথায় খোঁজাখুজি করিতেছে, কে জানে! মেয়েটি কিন্তু মোটেই কলেজে-পড়া মেয়ের মতো নয়। হার হারাইয়া বেচারী কি কান্নাটাই না কাঁদিয়াছে! কলেজে-পড়া মেয়ে যে এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নিজের চোখে না দেখিলে সে বিশ্বাসই করিত না। কলেজে-পড়া মেয়ে একলা পথ-চলায় নিশ্চয়ই অনভ্যস্ত নয়। খেলা দেখিতেও মাঝে মাঝে আসে। সুতরাং খেলার মাঠও অপরিচিত নয়। কিন্তু আকস্মিক হৈ চৈ, গ্যালারীতে অগ্নিকাণ্ড, পুলিসের লম্ফঝম্ফ,

সর্ব্বোপরি হার হারাণো, সবগুলি মিলিয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলীকে অবশ করিয়া দিয়াছে। ছেলেমানুষ! তাহার আর দোষ কি?

—আপনি কি ট্রামে যেতে পারবেন? না, ট্যাক্সি ডাকবো?

—না, ট্রামেই চলুন।

ট্রামরাস্তার কাছে আসিয়া অনুপম একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল। মেয়েটির চোখে তখন আর জল নাই বটে, কিন্তু মেঘও কাটে নাই।

অনুপম বলিল,—আপনার মুখখানি তো শুকিয়ে গেছে। একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক, কিম্বা সরবৎ। কি বলেন?

মেয়েটি কথা বলিল না, অন্যদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনুপম চলিবার উপক্রম করিতেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলিল,—না, না, আমি তাড়াতাড়ি ফিরতে চাই।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

এখন তাহার চা খাওয়ার সময় নাই। বাড়ীর সকলে তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দাদার জন্য তাহার নিজেরও উদ্বেগের সীমা নাই। এখন কি সময় নষ্ট করা চলে?

মেয়েটি যে শিক্ষিত ভদ্রবংশের সে বিষয়ে অনুপমের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে যে এত বড় সম্ভ্রান্ত বংশ তাহা ভাবে নাই।

বালিগঞ্জের দিকে একটা মস্ত বড় হাতা-ওয়ালা বাড়ী। ভিতরে প্রশস্ত লন, টেনিস খেলার জায়গাও আছে। সম্পূর্ণ বিলিতি প্রথায় সাজানো একখানি চমৎকার বাড়ী।

মেয়েটির নাম শ্যামলী। শ্যামলীই বটে। কালো? না কালো নয়,—কচি ঘাসের রং, পাউডার ও স্নোতে নীলাভ দেখায়।

আপনাকে কিন্তু চা খেয়ে যেতে হবে। আপনি রাস্তায় তখন চা খেতে চেয়েছিলেন।

—আমি? আচ্ছা।

শ্যামলীর মা আসিয়া কাছে বসিলেন। নানা প্রকারে অনুপমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে আত্ম-পরিচয় দিতে বসিলেন। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের বেশী হইবে তবু কম হইবে না। নিতান্ত শাদাসিধে, ভালোমানুষ লোক। ব্যারিষ্টারের গৃহিণী হইয়াও এই সেকেলে ভট্চায্ বাড়ীর মেয়ের অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

শ্যামলী ইতিমধ্যে কাপড় বদলাইয়া আসিয়াছে। পরণে তাহার কমলা রঙের অতি সাধারণ একখানি শাড়ী, মাথার এলো চুল পিঠের উপর ছড়ানো, পায়ে একজোড়া জরির স্যাণ্ডাল। মুখের সে মেঘ কাটিয়াছে। বরং অনুপমের মনে হইল, শ্যামলীর ঠোঁটের কোণে তাহার মনের উচ্ছ্বসিত হাসির আভাস জাগিয়াছে।

চাকর ট্রেতে করিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। শ্যামলীর

মা চা খান না। দুটি মাত্র বাটি,—একটি অনুপমের একটি শ্যামলীর। শ্যামলী চা ঢালিতে লাগিল।

—আপনি কি চিনি বেশী খান?

—একটু।

—তিন চামচ?

—তাই দিন।

চায়ের চিনি সম্বন্ধে শ্যামলীর মায়ের একটা কথা বলিবার ছিল, —যারা পরিশ্রম করে যথেষ্ট তাদের পক্ষে···

অকস্মাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—ও কি! ও কি!

এবং সঙ্গে সঙ্গেই অনুপম লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—না, না, ও কিছু নয়···কিছু হয় নি···

খানিকটা চা বাটি উছলাইয়া টেবিলে এবং অনুপমের গায়ে পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি হইত না। তাড়াতাড়ির মুখে হয়তো শ্যামলীর হাত লাগিয়া কিম্বা হয়তো টি-পটে ঠেকিয়া বাটিটাও উল্টাইয়া গিয়াছে।

শ্যামলীর মা গম্ভীরভাবে বলিলেন,—আরও সাবধান হ'য়ে চা ঢালতে হয়।

অনুপম আবার ব্যস্ত হইয়া বলিল,—না, না, ওঁর দোষ নেই। আমিই বোধ হয়..

শ্যামলীর মা সে কথা শুনিলেন না। বলিলেন,—গায়ে-টায়ে কোথাও পড়ে নি তো?

—কোথাও না।

ফিরিবার পথে অনুপমের মন সুমধুর রসে সঞ্চিত হইয়া উঠিল। কি চমৎকার মেয়ে! কী লজ্জা! কী নম্রতা! চা পড়িয়া যাওয়ার কথা মনে হইতেই অনুপম হাসিয়া ফেলিল। বেচারী কি অপ্রস্তুতই না হইয়াছে! অথচ অপরিচিত পুরুষের সামনে কোন মেয়ের না হাত কাঁপে? বরং না কাঁপিলেই মানায় না। তার উপর বিকালের কাণ্ডটাও তো কম নয়!

অনুপম নিজের মনেই আর একবার বলিল,—চমৎকার মেয়ে!

এই ঘটনার পরে কয়দিনই অনুপম শ্যামলীদের বাড়ার কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করিতে পারে নাই। একটা উপলক্ষ তো চাই। দিনরাত্রি অনুপম অনেক ভাবিয়াও বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার উপলক্ষ সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

অবশেষে মায়ের কাছে কথাটা পাড়িল।

শেষ পর্য্যন্ত যে ছেলের বিবাহে মতি হইয়াছে ইহাতেই মা ও পিসিমা কৃতার্থ হইলেন। ছেলে যখন নিজে সম্বন্ধ করিয়াছে, তখন মেয়ে নিশ্চয় দেখিয়াছে এবং হয়ত…এবং নিজে যখন দেখিয়াছে তখন মেয়ে অপরূপ সুন্দরী না হইয়া যায় না। অনুপমের খুঁৎখুঁতে স্বভাব! কোথাও এতটুকু খুঁৎ থাকিলে সে আর সেদিকে চাহিত না।

দিন কয়েক পরে একদিন টেলিফোনে খবর দিয়া মা ও পিসিমা

চলিলেন তাহাদের বাড়ী। অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হইল না। কিন্তু মেয়ে দেখিয়া তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। একে কালো, তাহার উপর রোগা টিংটিঙে। না মুখের শ্রী, না দেহের গড়ন, না চলার ভঙ্গি,—যেন ফড়িঙের মতো লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে। পিসিমার তো দেখিয়া পিত্ত জ্বলিয়া গেল! ছোঁড়াগুলোর কি চোখ বলিয়া কিছু নাই?

কিন্তু ছেলের যখন পছন্দ হইয়াছে তখন তার উপর আর কথা কি? এখন কথাটা পাড়া যায় কি করিয়া? শ্যামলীর মা তো বকিয়া চলিতেছেন। বাড়ীটা করিতে কত খরচ পড়িয়াছে, ছেলেটা কয়েক দিন পরেই বিলাত যাইবে, আরও অনেক কথা।

অনুপমের মা কথাটা পাড়িবার জন্য ঠাকুরঝিকে চোখ টিপিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াই ফেলিলেন,—

—আমরা ভাই, আরও একটা কাজের কথা বলতে এসেছিলাম।

শ্যামলীর মা তখন সবে নূতন টেবিলটার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বিস্মিতভাবে পিসিমার মুখের দিকে চাহিলেন।

—বলছিলাম কি, আমাদের অনুপমের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হ'লে বেশ হয় না?

কথাটা প্রথমে বুঝিতে শ্যামলীর মায়ের যেন দেরী হইতেছিল।

তার পর দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—অনুপম যে-দিন শ্যামলীকে বাড়ী নিয়ে এল সেইদিনই আমার এ কথা মনে হয়েছিল। ওর মতো জামাই পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। কিন্তু তা আর হবার উপায় নেই।

—উপায় নেই! কেন?

—ওর অন্য জায়গায় বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। তিনি শীঘ্রি বিলেত থেকে ফিরবেন। ফিরলেই...তারপর হাসিয়া বলিলেন,—ওদের অনেক দিনের জানা শোনা! আজকালকার মেয়ে। বুঝতেই তো পারেন। এখানে আর আমাদের কথা চলবে না।

মা ও পিসিমার মনে প্রথমে একটু দুঃখই হইয়াছিল। কিন্তু তারপরে তাঁহারা খুশীই হইলেন। মাগো! এই ছেলের পাশে ওই বৌ!

কিন্তু মায়ের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া অনুপম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইল। শ্যামলীর অন্যত্র বিবাহ স্থির হইয়াছে? আর সে বিবাহ ভালোবাসিয়া? অথচ সে যে স্পষ্ট শ্যামলীর চোখে···

শ্যামলীর চোখে কী দেখিয়াছে? স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোতিঃ? কিন্তু স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোতিঃ সম্বন্ধে তাহার কোনো অভিজ্ঞতা

—বাজাবে না কেন মা, বাজাবে। তবে অত নয়। জানো তো পাগলার ব্যাপার! এখুনি হয়ত বেঁকে বসবে।

মায়ের গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল, আর বলিতে পারিলেন না। ক্ষণেকের জন্য একবার নিশানাথের পরলোকগতা বধূকেও মনে পড়িয়া গেল বুঝি। অত রূপ, অত গুণ, কিন্তু স্বামী লইয়া দুদিন ঘর করিতেও পাইল না।

কিন্তু মেজ বৌ তাহাতে ভুলিল না। বড় লোকের মেয়ে, শ্বশুর বাড়ীতে তাহার অপ্রতিহত প্রতাপ। সে শ্বাশুড়ীকে ঠেলিয়া নীচে পাঠাইয়া দিতে দিতে বলিল,—কিচ্ছু হবে না মা, কিচ্ছু হবে না। শাঁখ না বাজালেই ঠাকুরপো চটবে।

এ কথার যুক্তি ছিল না। তবু মায়ের কেমন মনে লাগিয়া গেল। হাসিয়া বলিলেন,—তা যা হয় কর মা, কেবল বিভ্রাট যেন না বাধে।

তাঁহার ভয়ও নিতান্ত অমূলক ছিল না। এবং এ তাঁহার বাড়াবাড়িও নয়। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন :

সচ্চরিত্র বলিয়া নিশানাথের কোনো দিনই খ্যাতি ছিল না। কলেজে পড়িবার সময় হইতেই কতকগুলি চরিত্রগত দোষ তাহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিবাহের পরেও সেগুলি ত্যাগ

করিতে পারে নাই। অথচ রূপে গুণে অমন বৌ সংসারে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই জোটে। এই ব্যাপারে তাহার বন্ধুদেরও বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

সহজ অবস্থায় সে প্রাণপণে আপনার ব্যবহার সমর্থন করিবার চেষ্টা করিত:

—তাতে কি হ'য়েছে! আমার স্ত্রীর সঙ্গে তো আমি কোনদিন খারাপ ব্যবহার করি নি। তার অজ্ঞাতে এখানে-ওখানে গিয়ে যদি একটু আনন্দ পাই, তাতে কার কি ক্ষতি?

কিন্তু মত্ত অবস্থায় সেই 'এখানে-ওখানে' বসিয়াই নিশানাথ কাঁদিয়া কাটিয়া, শতমুখে স্ত্রীর প্রশংসা করিয়া এবং আপনার দুষ্কার্য্যের জন্য বিবিধ প্রকারে অনুতাপ প্রকাশ করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিত যে, বন্ধু বান্ধবে তাহার মাথায় ঘটি-ঘটি জল ঢালিয়া এবং অবিশ্রান্ত বাতাস করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না। ফিরিবার সময় হইলে ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিত। ন্যাকামি দেখিয়া বন্ধুদের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিত।

বলিত,—এতই যদি ভয়, তবে এখানে রোজ-রোজ আসাই বা কেন? কে সাধে আসবার জন্যে?

সত্যিই তো! কে সাধে?

নিশানাথ উত্তর দিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কতক্ষণ তাহাদের ক্রুদ্ধ মুখের পানে চাহিয়া থাকিত, তারপর নতমস্তকে চলিয়া আসিত।

তাহার এই নৈতিক অবনতির কথা সকলেই জানিত। তাহার স্ত্রীরও কানে না গিয়াছিল তাহা নয়। সে মাঝে-মাঝে সন্দেহ করিত, তিরস্কার করিত, কাঁদিত, অভিমান করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাও কহিত না। সবই করিত, কিন্তু মনে-মনে এ কথাও কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, তাহার এই স্বামী কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে স্থানান্তরে অন্য নারীর কাছে প্রেম নিবেদন করিতেছিল। নিশানাথকে কি লোকে তাহার চেয়ে বেশী চেনে? স্বামীর ভালোবাসায় কোথাও এতটুকু ফাঁকি থাকিলে সে টের পাইত সকলের আগে।

তবু যদি তাহার নিজেরও অগোচরে মনের নিভৃততম কোণে সূচ্যগ্র পরিমিত সন্দেহও থাকিয়া থাকে তাহার নিরশন হইল মৃত্যুশয্যায়।

পীড়িত স্ত্রীর সেবা আর কোন স্বামী না করে! কিন্তু সে কি এমন করিয়া? সর্ব্ববিধ আরাম এমন কি আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া নিশানাথ যে ভাবে তাহার স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা করিল এমন মানুষে পারে না।

—ওগো তুমি যাও, একটু শোও গে।

ক্লান্তিতে, অবসাদে নিশানাথ মাথাটা ঘাড়ের উপর সোজা করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তবু স্ত্রীর মাথার চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল,—তুমি বুঝি ভাব আমি ঘুমুই না? হুঁ! জানোই তো, ঘুমের এতটুকু ত্রুটি আমি সইতে পারি না। তুমি

চোখ বন্ধ করতে দেরী, তারপরে আমার ঘুমুতে তিন মিনিটও লাগবে না। সেদিকে ঠিক আছি।

নিশানাথ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

—ছাই ঘুমোও। আমি বুঝি কিছু বুঝতে পারি না, না? আমার কাছে চালাকি?

শেষের কথাগুলা ক্লান্তিতে এমন জড়াইয়া গেল যে, তাহার আর এক বর্ণও বোঝা গেল। সে পাশ ফিরিয়া অলসভাবে চোখ বুজিল। আর নিশানাথ চোখ দুটা ভালো করিয়া রগড়াইয়া আর একখানা বই খুলিয়া বসিল।

সেজ বৌএর সমবয়সী পাড়ার মেয়েরা প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে আসিত। তাহার স্বামীর সেবা দেখিয়া সকলের চোখে মুখে গভীর বিস্ময় ফুটিয়া উঠিত; তাহাদের বিস্ময় দেখিয়া অসহ্য পুলকে তাহার চোখ আপনি বুজিয়া আসিত।

কিন্তু মাসাধিক কাল দিন-রাত্রি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা না মানিয়া এত সেবা করার পরেও মৃত্যুকালে স্ত্রীর সঙ্গে নিশানাথের সাক্ষাৎ হইল না।

সেদিন সে একটু ভালোই ছিল। জ্বরটাও অন্যদিনের চেয়ে কম। এ কয়দিন কথা তাহার একরূপ বন্ধই হইয়া আছিল। বহুকষ্টে স্খলিতকণ্ঠে দুই-চারিটা কথা বলিতে গেলেই হাঁফাইয়া উঠিত। কিন্তু সেদিন সকাল বেলা হইতে বাক্‌শক্তিও অনেকখানি ফিরিয়া আসিল। এমন কি, স্বামীর শুষ্ক মুখ দেখিয়া একটা রসিকতাও করিয়া বসিল।

বিকালের দিকে তাহাকে অনেকটা ভালো মনে হইল। এবং মেজবৌ কিছুতেই নিশানাথকে রোগিনীর পাশে বসিতে দিল না, একরকম জোর করিয়াই বাহিরে পাঠাইয়া দিল। নিশানাথেরও মনে হইল এখন একবার স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া আসা যাইতে পারে।

নিশানাথ বেড়াইতে বাহির হইল। বহুদিন বাহিরে আসে নাই। রাস্তার পড়িয়াই তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু খানিকটা পথ চলিয়াই মনে হইল, কোথায় যাওয়া যায়? আগে কখন কোথায় গেলে কাহাকে পাওয়া যাইতে পারে তাহার একটা স্থিরতা ছিল। অনেকদিন কাহারও সঙ্গে না মেশার সে 'রুটিন' নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে কাহারও বাড়ী থাকিবার কথা নয়। তাহার বন্ধুদের কেহ এই সময়টা সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকে না এবং তাহাদের সন্ধ্যা যাপনের স্থানও ঠিক ভদ্রপল্লী নয়। সুতরাং...

কিন্তু সে চিন্তা নিশানাথ মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার চেয়ে বরং কলেজ স্কোয়ারে কয়েকটা চক্র দিয়া বাড়ী ফেরাই ভালো। এই সঙ্কল্প করিতেই নিশানাথের মন বেশ পুলকিত হইয়া উঠিল। অসুস্থ স্ত্রীর জন্য এই প্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া সে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল।

কিন্তু চিরদিন বন্ধুবান্ধব লইয়া আড্ডা দেওয়া যাহাদের অভ্যাস তাহাদের কি একা-একা কলেজ স্কোয়ারে বেড়াইতে ভালো লাগে? একবার ঘুরিয়াই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। জনতার মধ্যেও তাহার

কেমন একা-একা বোধ হইতেছিল। বিরক্তভাবে একটা বেঞ্চে গিয়া বসিল।

চারিদিকের আলো জলের উপর পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল। অন্ধকারে বসিয়া তাহা দেখিতে বেশ লাগে। নিশানাথের মনে হইতে লাগিল, সে যেন এই প্রথম কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া বসিয়াছে,—এমন চমৎকার! কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাকে এ দৃশ্য উপভোগ করিতে হইল না। দুটি কলেজের ছেলে বোধ করি অনেকক্ষণ ভ্রমণের পর ক্লান্ত হইয়া তাহারই বেঞ্চের একাংশে আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। তাও নিঃশব্দে নয়, দুজনে এমন উত্তেজিতভাবে হাইড্রোষ্ট্যাটিক্‌স্ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিল যে, নিশানাথকে বাধ্য হইয়া উঠিতে হইল।

কিন্তু যায় কোথায়?

ঘড়িতে তখন মোটে সাড়ে সাতটা। এত সকালে বাড়ী ফিরিতেও ইচ্ছা করে না। মাসাধিক কাল পরে ছাড়া পাইয়া এখন প্রায়ান্ধকার শয়নকক্ষের মধ্যে রুগ্না স্ত্রীর পাশে রাত্রিযাপন করিবার কথা মনে হইতেই মন দমিয়া যাইতেছিল। সে যেন স্কুলের ছেলে, অনেকক্ষণ 'ডিটেন্‌শনের' পরে ছাড়া পাইয়াছে।

অথচ কীই বা করা যায়! সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে নিশানাথ অলস গতিতে পথ চলিতেছিল। এমন সময় একখানি ট্রামগাড়ী তাহারই পাশে আসিয়া থামিল। তাহার মনের থামানো

এঞ্জিনে কোন দেবতা অকস্মাৎ পুরাদম দিয়া দিলেন জানি না, নিশানাথ লাফাইয়া ট্রামে গিয়া উঠিয়া বসিল।

তারপর? তারপর সেই চিরপুরাতন কক্ষ, চিরপুরাতন বন্ধুমণ্ডলী, বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা মদিরেক্ষণা নারী এবং...

বাড়ী যখন ফিরিল তখন কান্নার রোল উঠিয়াছে। নিশানাথের মাথা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। বাম হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া সে দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। তারপরে কি হইয়াছে আর সে স্মরণ করিতে পারে না।

তাহার ভাব দেখিয়া সকলেই ভয় পাইয়া গেল।

স্ত্রী-বিয়োগের পর নিশানাথ কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হইয়া উঠিল। কিছুতে প্রবোধ মানে না, কেবল হাউ হাউ করিয়া কাঁদে। আহার গেল, নিদ্রা গেল, দিবারাত্রি বিছানায় গড়াগড়ি দেয় আর থাকিয়া-থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। ব্যাপার দেখিয়া তাহার বিধবা জননীও সেই ঘরের মেঝেয় শয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনো উপকারই হইল না। মা পুত্রকে প্রবোধ দিবার জন্য একটা কথাও বলিতে পারেন না। নিঃশব্দে শুইয়া-শুইয়া পুত্রের মর্ম্মপীড়া অনুভব করেন, পুত্রের দীর্ঘ নিশ্বাস পতনের শব্দে তাঁহার চোখে আর ঘুম নামে না।

ছয় মাস এমনি গেল।

তারপরে ধীরে ধীরে এক আধবার করিয়া নিশানাথ বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিল। পরিচিতদের সঙ্গে বাক্যালাপও করিতে লাগিল। মাঝে-মাঝে বন্ধুবান্ধব আসে। মা দ্বারে কান পাতিয়া থাকেন। নিশানাথ কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃত মুহূর্ত্তে কাহাকেও পরিহাস করিলে তাঁহার মনে আর আনন্দ ধরে না।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। নিশানাথ খায় দায়, ঘুমায়, বেড়াইতেও বাহির হয়। কিন্তু সে যেন কলের পুতুলের মতো। কোথাও তাহার উৎসাহ নাই। মৃত্যুর সময় সে স্ত্রীকে দেখা দিতে পারে নাই একথা যখনই ভাবে তখন কিছুতে আর নিজেকে ক্ষমা করিতে পারে না। অথচ কি আশ্চর্য্য! সেদিন যে সে মারা যাইতে পারে এ কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে নাই। তাহা হইলে কি সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাহিরে থাকিত?

কিন্তু তাই বা কেন? মনের অগোচরে তো পাপ নাই! যেখানে যেখানে যাহাদের সঙ্গে সে সন্ধ্যা যাপন করিয়াছে তাহাদের কাহাকেও সে ভালোবাসে নাই, কাহারও উপর মুহূর্তের জন্যও তাহার মোহ পড়ে নাই। আপনার মন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখে কোথাও গ্লানি নাই, কলঙ্কের চিহ্নমাত্র নাই,—তাহার সমস্ত মন শিশুর মনের মতো শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ।

তবে মুমূর্ষু পত্নীকে ফেলিয়া কেনই বা গিয়াছিল? কিসের

জন্য? নিশানাথ অবিরত আপনাকে আপনি প্রশ্ন করে, কেন, কেন, কেন?

কোনো জবাব পায় না।

ছেলের পানে চাহিয়া মায়ের বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া ওঠে। তাহার শরীর দিনদিন শীর্ণ হইতে লাগিল। মাথার লম্বা লম্বা চুল বাতাসে উড়িতেছে। চোখের দৃষ্টি শূন্য। আপন মনেই যখন-তখন হাসে, সে হাসি দেখিলে ভয় লাগে।

মা বলিলেন,—চল, বরং কোথাও থেকে দু'দিন ঘুরে আসা যাক। কি বলিস?

নিশানাথের এই বাড়ী, এই শয়নকক্ষ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু 'না' বলিবার শক্তিও যেন লোপ পাইয়া গিয়াছে। সে শুধু বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

'চেঞ্জ' হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিশানাথের কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। চিরদিনই সে একটু বাবু মানুষ। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর বেশভূষার দিকে তাহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি ছিল না। বিদেশে মায়ের পাল্লায় পড়িয়া সে দৃষ্টি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন

সে অনেকটা সহজ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কেবল খুব বিশেষ লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, একটুখানি অবসাদ এখনও আছে। তাহার আহার-বিহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া বৌদের মধ্যে আড়ালে হাসাহাসি চলিল।

—পুরুষ মানুষের শোক। ছ'মাস যে চলল এই [illegible], কি বলিস ছোট বৌ?

ছোট বৌ নিতান্তই ছেলেমানুষ। অতি অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছে। পুরুষ মানুষের উপর এখনও আস্থা হারায় নাই। মেজ বৌ'এর কথায় সে শুধু একটু টিপিয়া হাসিল।

কিন্তু বড় বৌ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—তুই [illegible] তো মেজ বৌ। তোর সব তাতেই ঠাট্টা। ওর মনের ভেতর কি [illegible] তার তুই কি জানিস?

বড় জা'এর কাছে ধমক খাইয়া মেজবৌ চুপ করি[illegible] বটে, কিন্তু মেজ ভায়ের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। স্ত্রীর ক[illegible] পুরুষ মানুষের চাপল্য সম্বন্ধে যখন-তখন খোঁটা খাইয়া ভদ্র[illegible]ক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

বড় বৌ নিশানাথেরই সমবয়সী, কিন্তু দেখিলে [illegible]নে হয় যেন কত বড়। এমনই গিন্নী হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ মানুষের ভালো-মন্দ কোনো কথা লইয়াই উত্তেজিত হইবার বয়স তাহার চলিয়া গিয়াছে। নিশানাথকে সে ছোট ভায়ের মতো বুকে তুলিয়া লইল। নিজে সুমুখে বসিয়া তাহাকে খাওয়ায়, তাহার ঘর ঠিক করিয়া

গুছাইয়া রাখে, এমন কি রাত্রে তাহাকে শোয়াইয়া নিজের হাতে মশারি গুঁজিয়া, আলো নিভাইয়া চলিয়া যায়।

মাস দুয়েক এমনি আদর যত্নের পর বড় বৌ একদিন কথাটা পাড়িল।

তাহার মাসতুতো বোন, দেখিতে অবশ্য আগের বৌএর মতো সুশ্রী নয়। কিন্তু গুণে...

—রূপের তৃষ্ণা আমার মিটে গেছে বৌদি। সে নয়, কিন্তু ও সব চেষ্টা তোমরা কোরো না, বৌদি। বিয়ে আর আমি করতে পারব না।

দুধের বাটিটা আগাইয়া দিয়া বড় বৌ বলিল,—সে কি হয় ভাই? না তাই ভালো দেখায়? আমরা না হয় পর, কিন্তু মায়ের মুখের পানে একবার চেয়ে দেখ দিকি।

দুধের বাটিটা মুখে তুলিতে গিয়া নিশানাথ চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো! সে শুধু নিজেরই দুঃখের কথা ভাবিয়াছে, মায়ের মুখের পানে তো একদিনও চাহিয়া দেখে নাই!

সেদিন আর সে কোনো কথা বলিল না বটে, কিন্তু ঐখানেই শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের সব স্থির হইয়া গেল,—বড় বৌএর মাসতুতো বোনের সঙ্গে।

মেজবৌ কিন্তু ছাড়িল না।

সে শাঁখ বাজাইল, উলু দিল এবং সমানে হৈ চৈ করিল। তাহার উৎসাহে বাধা দেয় কাহার সাধ্য!

কিন্তু বড় বৌএর বুক দুরু দুরু কাঁপে। ক্ষণে ক্ষণে সে নিশানাথের মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করে। নববধূ কালো অবশ্য নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু আগের স্ত্রীর তুলনায় কালো বই কি? বড় বৌএর দুর্ভাবনার আর অন্ত নাই। সমস্ত দিন ধরিয়া সে নববধূকে নূতন নূতন করিয়া সাজায়, চাহিয়া চাহিয়া দেখে কোন সাজে তাহাকে মানাইবে ভালো। আর পাখী পড়ানোর মতো করিয়া শিখায় কেমন করিয়া স্বামীর মন ভুলাইতে হইবে।

ফুলশয্যার রাত্রে বর-বধূকে রাখিয়া চলিয়া আসিবার সময় বড় বৌ দ্বারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া যখন তাহাদের পানে চাহিল, নিশানাথ স্পষ্ট দেখিল, তাহার চোখের কোণের দুটি বিন্দু অশ্রু উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করিতেছে।

নিশানাথ অনেকক্ষণ মাথা নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। সুমুখেই তাহার প্রথমা স্ত্রীর একখানি বড় ছবি ঝুলিতেছিল, মুখ তুলিতেই সেখানি তাহার চোখে পড়িল। ফোটোটি তাহার নিজের হাতে তোলা। এই শয়নকক্ষে এই খাটের উপর সে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। স্বামীর পানে চাহিয়া হাসি[illegible] যে ভ্রূকুটি করিয়াছিল তাহা এখনও ছবিখানির পানে চাহিলেই নিশানাথের স্পষ্ট মনে পড়ে। যেন গত কল্যকার কথা।

নিশানাথ একদৃষ্টে সেই ছবিখানির দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। সেখান হইতে তাহার চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে আসিয়া

নববধূর মুখের উপর পড়িল। নিতান্ত কচি মুখ! পুরুষের মনে কত দ্বন্দ্ব চলে, কত ঝড় বয় সে কি তাহার কিছু জানে? কোন পাপে এই ফুলের মত কোমল মেয়েটির ভাগ্য তাহার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হইয়া গেল কে বলিবে?

দৃঢ় পদক্ষেপে নিশানাথ ছবির কাছে গিয়া সেখানি নামাইল। দাঁতে দাঁতে চাপিয়া খোলা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। আসল মানুষ যদি চলিয়া যায়, কি হইবে তাহার ছবি বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া? কি লাভ?

জানালার বাহিরে হাস্নুহানার ফুল ফুটিয়াছিল। ঘরের মধ্যে তাহার মৃদু গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। বাগানে চাঁদের আলোর যেন বান ডাকিয়াছে। ছবি আর ফেলিয়া দেওয়া হইল না।

—তোমার দিদির ছবি। তুমি রাখবে এখানা? না, না, দেওয়ালে নয়, তোমার বাক্সের ভেতর বুঝলে?

নববধূ সবিনয়ে ঘাড় নাড়িল।

নিশানাথ খুসী হইয়া উঠিল। পরম স্নেহে তাহার মুখখানি আলোর দিকে তুলিয়া ধরিল। মেয়েটি চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল না। তাহার নিমীলিত নয়নের কোণ বহিয়া দু'ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। নিতান্ত ছোট মেয়ে তো নয়, কিছু কিছু বোঝে।

নিশানাথ মুখখানি নামাইয়া দিয়া আবার জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এমন করিয়া বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া থাকিলে

তো চলিবে না। আরও অনেক দিন তাহাকে বাঁচিতে হইবে,—দশ বৎসর, বিশ বৎসর, হয় তো তারও বেশী।

নিশানাথ আস্তে-আস্তে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—আলো নিভিয়ে দিই?

নববধূ আবার সবিনয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—দাও।

পাথেয়

প্রতিমা মেজদার শালীর নাম ;—আমার জীবনের প্রথম নারী।

বছর দশেক আগের কথা। সেজদার বিয়েতে ওরা সবাই এসেছিল। সেই সময় মেজ বৌদি মাকে ধরে বসলেন, প্রতিমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতেই হবে। সেবার আমি বি-এ দিই।

অমন মেয়ে মা পছন্দ না করে পারেন নি। সুতরাং মেজ বৌদি আর মায়ের মধ্যে কথাটা পাকাই হয়ে গেল। তবে বছর খানেক পরে হবে। তাতে কোনো পক্ষেরই আপত্তি করার কিছু ছিল না। কারণ আমার বয়স তখন কুড়ি, আর প্রতিমার চোদ্দর বেশী নয়।

তা ঠিক, তাড়া কিছু ছিল না। সুতরাং কথাটা ওর বেশী আর এগুলো না,—ওঁদের দুজনের মধ্যেই গোপন রইল। ওঁরা জানতেও পারলেন না যে, গোপন ঠিক নেই, অর্থাৎ আমরা দুজনেই জেনে ফেলেছি।

আমাদের বাড়ীতে গিন্নি বলতে বড় বৌদিকে বোঝায়। তিনি যখন এ বাড়ীতে আসেন আমরা তখন ছোট ছিলাম সত্যি। কিন্তু তারপরে যে অনেক বছর কেটে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বয়োবৃদ্ধি হয়েছে এই খবরটা তাঁর কাছে আর পৌঁছুলো না। না পৌঁছুবার কারণ আছে। মা আমার দুর্ব্বল মানুষ, তার ওপর অনেকগুলি ছেলে-পুলে নিয়ে তিনি দিনরাত্তির বিব্রত থাকতেন। বড় বৌদি আসামাত্র তাঁর হাতে সমস্ত সঁপে দিয়ে তিনি নামে মাত্র এ সংসারের অধীশ্বরী হয়ে রইলেন। ফলে বড় বৌদির খাটুনীও বাড়লো, বকুনিও বাড়লো,—বাড়লো না শুধু আমাদেরই বয়স আর মর্য্যাদা।

কিন্তু সুবিধা হ'ল মেজ বৌদির। তিনি প্রথম প্রথম এসে বড় বৌদির সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু কারও হাতের কাজ বড়বৌদির পছন্দ হয় না। তিনি দু'তিন দিন কিছু বললেন না। তৃতীয় দিনের দিন তাঁর কান চেপে ধরে মেজদার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে মেজদাকে শাসিয়ে এলেন—পাঁচটার আগে পদ্ম নীচে গেছে কি তার কান ছিঁড়ে দোব, বুঝলে ?

মেজদা সসম্ভ্রমে বললেন,—নিশ্চয় বুঝলাম। কিন্তু আমরা কি লুডো খেলতে পারি ?

—তা পারো। তাই বোলে বেশী চেঁচিও না,—পাশের ঘরে মা ঘুমোচ্ছেন।

এই আদেশ মেজবৌদি কোনো দিন অমান্য করেন নি। বেশ

মনে আছে, সেজদার বিয়ের সময়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। মেজবৌদি, নতুন সেজবৌদি, প্রতিমা আর আমি সমস্তক্ষণ শুধু খেলাই করতাম,—কখনো লুডো, কখন তাস।

সেই অবসরে প্রতিমাকে আমি ভালোবেসে ফেললাম। মনে হ'ত এই পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে কোনো পুরুষ কোনো নারীকে এমন ভালোবাসেনি। আমার সমস্ত চিত্ত সাবানের ফেণার বেলুনের মতো হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু এই অত্যন্ত গোপন কথাটি যাকে জানানো নিতান্তই প্রয়োজন সে কেবলি পালিয়ে বেড়ায়, তাকে আর একলা পাইনা।

অবশেষে একদিন তাকে একলা পাওয়া গেল, এবং এমন দিনে যেদিন তাকে পাওয়ার আমি মোটেই আশা করি নি। সেদিন বিকেলে আমি ছাদে পাইচারী করতে করতে একখানি বই পড়ছিলাম। পায়ের শব্দে হঠাৎ পিছন ফিরে চাইতেই দেখি, প্রতিমা। একখানি ভিজে কাপড় হাতে ক'রে ও ছাদে এসেছিল সেখানি শুকুতে দিতে। আমাকে দেখেই বিব্রতভাবে একটু থমকে দাঁড়ালো। এক পা এক পা ক'রে আমিও ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম!

ওকে আমি বলতে চেয়েছিলাম,—তুমি যেন রঙীন একখানি

মেঘ। আমার চিত্তের আকাশে পাল তুলে কেবলি ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু কিছুই বলতে পারি নি। আমার সামনে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে ও যেন থর-থর ক'রে কাঁপতে লাগলো। আর আমি? নিঃশব্দে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীচে নেমে এলাম।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। প্রতিমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। মধ্যে শুনেছিলাম, ওর বিয়ে হ'য়েছে হাজারিবাগে। ওর স্বামী বিলেত থেকে পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ার। প্রতিমার বাপ-মাকে দোষ দেওয়া যায় না। এমন পাত্র কে-ই বা ছাড়ে!

বিয়ে থেকে ফিরে এসে মেজবৌদি কত গল্পই করলেন। কিন্তু যে কথাটা জানবার জন্যে আমি আকুল হ'য়ে উঠেছিলাম, সে সম্বন্ধে কোনো কথাই কেউ বললেন না। সে কি কেউ দেখেছিল? দেখেছিলাম একশো মাইল দূরে বসে আমি,—একটি ফোঁটা জল সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু এ সংসারে একটি ফোঁটা চোখের জলের মূল্য কি!

তারপরে আমার জীবনে নারীর অভাব অবশ্য হয় নি,—কারো জীবনেই হয় না! নিজেকে আমি নির্ম্মমভাবে ধ্বংস

করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই খবরটি অনেক দূরের একটি মেয়ের কাছে একদিন পৌছুবে। সেইখান থেকে একটি ফোঁটা অশ্রু আমার পাওনা হবে। কিন্তু এ সংসারে কে কার খবর রাখে! জীবনের রথ ছুটেছে তীরের বেগে। পিছনে চাওয়ার কারও কি অবসর আছে?

বাড়ীতে সবাই আমার বিয়ের জন্যে তাড়া লাগায়। আমি কেবলি এড়িয়ে চলি। ভেবেছিলাম, আমার বুকে কোথায় কাঁটা বিঁধেছে, সে কথা অন্ততঃ একটি লোক বুঝবে,—অন্ততঃ একটি লোক একটি বারও আমায় সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু মেজবৌদির ছেলেটি কেবলি ভোগে,—জ্বর সারে তো পেটের অসুখ, পেটের অসুখ সারে তো আবার জ্বর। আমার দিকে চাওয়ার তাঁর সময় নেই।

এমনি ক'রে আরও অনেকদিন গেল। আমার ভালো হওয়ার আশা সবাই শেষে ছেড়ে দিলে।

এই ক'বছরে আমার লাভ হয়েছে খ্যাতি। আমার লেখা অনেক লোকের ভালো লাগে। আমার চরিত্র নাকি অনেক মেয়ের কৌতূহলের বস্তু। কলেজের মেয়েদের মেসে এ নিয়ে গবেষণার আর অন্ত নেই। সকালে-সন্ধ্যায় তাঁরা আমার বই পড়েন, আর প্রাণ ভরে গালাগালি দেন। আমার চরিত কথা শেষে সত্যে-মিথ্যায় উপন্যাসকেও ছাড়িয়ে গেল। জীবন ভরে এই হ'ল আমার সঞ্চয়—অপরিমিত খ্যাতি এবং অপরিমিত অখ্যাতি। কিন্তু তাই বা ক'জন পায়?

এমনি সময় হঠাৎ আমার ডাক পড়লো হাজারিবাগে। ওখানকার ছেলেদের সমিতির বার্ষিক উৎসব। তারা কি ক'রে খবর পেয়েছে এবার বড়দিনে আমি যাচ্ছি হাজারিবাগ বেড়াতে। এই সুযোগটা ওরা কাজে লাগাতে চায়।

তাই হ'ল। সেই বিপুল সভায় আমাকে বক্তৃতাও দিতে হ'ল। কি বলেছি মনে নেই। কাগজে তার বিবরণ পড়ে বুঝলাম, যা বলেছি তার কিছুই সাহিত্য সম্বন্ধে নয়, সবই আমার নিজের সম্বন্ধে। একটি সুশোভন বিনয়ের অন্তরালে অগণিত শ্রোতার শ্রদ্ধা দিয়ে আমি শুধু আমার অহঙ্কারের পেট ভরিয়েছি। কিন্তু তাই দিয়েই করতালিও কম পাই নি, ফুলের মালাও কম পাই নি।

সভার শেষে যখন বেরিয়ে এলাম অগণিত ভক্তের বেষ্টনীর মধ্যে মনে হ'ল আমার শির যেন মেঘ ছুঁয়েছে। ভক্তদের পানে চেয়ে অবাক হ'য়ে ভাবলাম, মানুষ এত ছোট!

হঠাৎ চোখ পড়লো একটি ফুটফুটে ছেলের উপর। ভয়ে ও সঙ্কোচে সে দূরে দূরে ঘুরছে। মনে হ'ল, আমায় সে কিছু বলতে চায়। হয়তো একটা অটোগ্রাফ চায়।

ডাকতেই সে সবিনয়ে কাছে এলো।

জিগ্যেস করলাম,—তুমি কি চাও খোকা?

সে সলজ্জভাবে বললে,—আমার মা আপনাকে একটিবার ডেকেছেন।

—তোমার মা? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, খোকা।

খোকা একটু ভড়কে গেল। বললে,—আমি মহেশবাবুর ছেলে। আপনার মেজ বৌদি আমার মাসিমা হন।

ঠিক, ঠিক।

জিগ্যেস করলাম,—তোমরা কি কাছেই থাকো?

একটু দূরে তার কতকগুলি সমবয়সী তার দিকে সশ্রদ্ধভাবে চাইছিল। সেদিকে একবার বিজয়গর্ব্বে তাকিয়ে খোকা নবাবগঞ্জের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে,—ওই দিকে। বেশী দূর নয়।

—তাহ'লে চল।

কিন্তু আমার ভক্তের দল ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বললে,—একটু পরে গেলে হয় না? আমরা...

ওদের আরও কিছু আয়োজন হয় তো ছিল। কিন্তু আমি বললাম,—না, এখনই একবার যাই। আমার বেশী দেরী হবে না।

বড় চমৎকার ছেলেটি, যেমন সপ্রতিভ, তেমনি সদানন্দময়। গাড়ীতে আমার পাশে ব'সে ওর মনে খুশী আর ধরে না। খোকা টিয়াপাখীর মতো কেবলি ব'কে চলে। সে অনেক কথা, এবং তার অধিকাংশই ওর মায়ের কাছ থেকে শোনা গল্প। তার কতক বা আমার কাণে গেল, কতক গেল না। আমি তখন ভাবছিলাম একটি বেপথুমতী মেয়েকে, আজকে সন্ধ্যায় যে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। হয়তো সে একটি কার্পেটের আসন তৈরী করে রেখেছে, বহু রাত্রি জেগে, একদিন আমি আসব জেনে। আজকে সেই

আসনটি সে বার করেছে, কিন্তু পাততে পারছে না, লজ্জা করছে।

এমনি সময়ে আমার গাড়ী এসে ওদের গাড়ী-বারান্দায় থামলো। খোকা আমার হাত ধরে টানতে টানতে একটি ঘরে নিয়ে এল। বিলাতী কেতায় সাজানো চমৎকার একটি বৈঠকখানা ঘর।

আমি জিগ্যেস করলাম,—তোমার বাবাকে দেখছিনা খোকা, তিনি কোথায়?

খোকার তখন কথা বলবার ফুরসুৎ নেই।

—তিনি ক্লাবে গেছেন। এখুনি আসবেন।

বলেই সে ভিতরের দিকে ছুটলো, আমার আসার কথাটা চীৎকার করে জানাবার জন্যে। কিন্তু কার যেন চাপাকণ্ঠের তাড়ায় তার চীৎকার মধ্যপথেই থেমে গেল।

একটু পরেই দেখতে পেলাম, দুখানি চরণ বাইরে পর্দ্দার ওদিকে থেমে গেল। এক মিনিটও নয়, পর্দ্দা সরিয়ে প্রতিমা অত্যন্ত সহজ ভাবে এসে আমায় প্রণাম করলে।

এতক্ষণে খোকার খেয়াল হ'ল আমাকে তার প্রণাম করা হয় নি। সেও টিপ করে একটা প্রণাম ক'রে মায়ের কোল ঘেঁসে দাঁড়াল।

প্রতিমা জিগ্যেস করলে,—মেজদি ভালো আছে? বড়দি সেজদি, জামাই বাবু…

—হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে।

একটু ইতস্তত ক'রে প্রতিমা সলজ্জভাবে বললে,—আপনার স্ত্রীর নামটি ভুলে গেছি। তিনি...

এবারে আমি হেসে ফেললাম। একটু দুঃখও হ'ল। বললাম,—তুমি আমার কোনো খবরই রাখো না, প্রতিমা! মিথ্যে ঢাকবার চেষ্টা করছ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম,—আমি বিয়ে করিনি, প্রতিমা।

প্রতিমা অবাক হ'য়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল।

তাড়াতাড়ি বললাম,—কিন্তু আমাকে কেন ডেকেছ, প্রতিমা? তোমার কি কিছু বলবার ছিল?

—না, অনেক দিন দেখি নি। তাই···

—অনেক দিন দেখনি। কিন্তু আমি যদি মরেই যেতাম?

প্রতিমা হেসে ফেললে,—তাহ'লে ডাকতাম না নিশ্চয়ই।

খোকার মাষ্টার এসে খোকাকে ডাকতেই সে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পড়ার ঘরে চলে গেল।

আমি বললাম,—কিন্তু আমাকে ডাকতে তোমায় ভয় হ'ল না? আমার কথা কি তুমি কিছু শোনো নি?

প্রতিমা একটুক্ষণ কি ভাবলে। তারপর খুব স্পষ্ট স্বরে বললে,—আপনার কথা সবাই শুনেছে, আমিও শুনেছি। কিন্তু সব কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, আমি তো আপনাকে জানি।

আমি একটু ম্লান হেসে বললাম,—তুমি আমার কিছুই জানো না। আমাকে ডেকে তুমি ভালো করনি, প্রতিমা। আজকে আমি বরং উঠি।

—এক মিনিট বসুন।

বলে প্রতিমা ত্বরিতে ভিতরে চলে গেল। আলমারিটির ওপর আমার এতক্ষণে নজর পড়লো। নানা জাতীয় বইই তাতে আছে, কিন্তু একটি থাকে আমার বইগুলি যেন বিশেষ যত্ন ক'রে সাজানো। সেগুলির পানে চেয়ে আমার চোখ জলে ভরে এল।

প্রতিমা ফিরে এল। তার একটি হাতে জলখাবারের রেকাবী, আর একটি হাতে গ্লাস।

—আপনি তো চা খান না।

হেসে বললাম,—আগে খেতাম না, এখন খাই। আমার অনেক কিছু গেছে প্রতিমা, আবার অনেক কিছু পেয়েছি। কিন্তু হিসেব ক'রে দেখেছি, যা পেয়েছি তার চেয়ে গেছে অনেক বেশী।

একটু কুণ্ঠিতভাবে বললাম,—আর হয়তো তোমার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না। আজকে যদি কোনো কথা বলি তুমি অপমানিত বোধ করবে না তো?

প্রতিমা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

—হিসেব-নিকেশের কথাই বলি। তোমরা জানো, যশ, অর্থ, মান অনেক কিছুই আমি পেয়েছি। কিন্তু এর যে কিছুই মূল্য নেই সে জানি শুধু আমি। তবু অনেক দুঃখেও আমার

সান্ত্বনা ছিল এই যে, একটী লোকের মনে আমি আজও বেঁচে আছি। আজ সে সান্ত্বনাও অবশিষ্ট রইল না। ভাবছি, নিজের চোখে নিজের মৃত্যু দেখতে আমার কিই বা প্রয়োজন ছিল!

প্রতিমা বললে,—আপনার চা নিয়ে আসি দাঁড়ান।

—আনো।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ পেয়ে প্রতিমা ফিক্ করে হেসে বললে, —উনি আসছেন।

উনি মানে মহেশ বাবু। প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া চেহারা। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কথা বলেন।

—ও, এই যে! কতক্ষণ এসেছেন? আমার আবার ক্লাবে—

ব'লেই প্রতিমার পানে চেয়ে মুচকি হেসে মহেশবাবু বললেন,—চিনতে পেরেছি গো। কম-সে-কম তিনশো বার ওঁর ছবি দেখেছি, বুঝলে?

তারপরে আমার পাশের চেয়ারে ধুপ ক'রে ব'সে বললেন,— দেখা হ'ল, ভালোই হ'ল। আপনি যে আমাকে কি বিপদে ফেলেছেন, সে আপনিও জানেন না। সেই কথাটা নিজের কাণে শুনে যান। দেখুন, আমি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ,—বাড়ী তৈরী করতে দিন, রাস্তা বানাতে দিন, সে আমি পারি। কিন্তু আপনাদের ও গল্প-টল্প আমি বুঝিও না, বুঝতে পারিও না, আর ভালোও লাগে না। এ সব কথা আপনি বুঝবেন, কিন্তু বোঝান তো দেখি আপনার ভক্তদের? বললে বিশ্বাস করবেন না, আপনার

এই ভক্তটির জন্যে আপনার সমস্ত বই রীতিমত পড়তে হয়েছে, এবং তাতেও নিষ্কৃতি পাই নি, তার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আপনি শুধু আপনার ভক্তটিকে এই কথাটি বুঝিয়ে দিয়ে যান যে...

মহেশ বাবু কথা শেষ করতে পারলেন না, উঃ! বলে চীৎকার করে উঠলেন।

—কি হ'ল?

—চিমটি কেটে দিচ্ছে মশাই! দেখলেন তো!

বলে মহেশবাবু হতাশ ভাবে আমার পানে চাইলেন!

ভক্তটির পানে চেয়ে দেখলাম, সে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে মহেশ বাবুর পায়ের জুতো, মোজা খুলে নিলে, যেন কিছুই হয় নি। মহেশবাবু গায়ের কোটটি নিজেই খুলে প্রতিমার কাঁধের উপর ফেলে দিলেন!

—আসছি।

ব'লে প্রতিমা বেরিয়ে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম ও গেল চা আনতে। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি [illegible]।

বললাম,—আচ্ছা, আজকে তাহ'লে উঠি [illegible]শবাবু। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারী খুসী হ'লাম। নমস্কার!

—সে কি মশাই! এরি মধ্যে? আজকে রাত্রিতে···

আমি করযোড়ে জানালাম, সে হবার নয়। আমি বরং আর একদিন আসব।

এর মধ্যে প্রতিমা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল।

তাকে বললাম,—আর একদিন আসব, প্রতিমা।

প্রতিমা নিঃশব্দে এসে আমার পায়ের ধুলো নিলে।

আমার গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। বললাম,—লেকের ধারে চল।

লেকের ধার তখন নির্জ্জন হ'য়ে গেছে। তারই একদিকে ঘাসের ওপর বসলাম।

অনেকদিন পরে প্রতিমার সঙ্গে দেখা হ'ল। অনেক পরিবর্ত্তনই তার হয়েছে,—দেহে, মনে, সব দিক দিয়ে। লাজুক ও বরাবরই, কিন্তু কচি মুখখানিতে কেমন একটা গাম্ভীর্য্য এসেছে। আর মহেশবাবুটিও চমৎকার! ছেলে মানুষের মতো সরল সদানন্দময়।

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

লীলা রায়কে মনে পড়লো। আমার জন্যে সে অনেক দুঃখ সয়েছে, ভবিষ্যতের অনেক প্রলোভনও ত্যাগ করেছে।

তবু কেমন ভরসা পাই না। এই বয়সে আর নতুন করে নীড় বাঁধা চলে না। নীড় বাঁধবার মনটি যেন হারিয়ে গেছে। সে হয় না। তার চেয়ে যশ, অর্থ, মান,—তুমুল করতালি আর প্রচুর ফুলের মালা, বহু লোকের শ্রদ্ধা—সেই ভালো, সেই ভালো।

—এই যে, আপনি এখানে ? আমরা খুঁজে খুঁজে...

হাজারিবাগের সাহিত্যিক ছেলের দল আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে। কিন্তু এ জীবনে 'ওইটুকুই তো আমার পাথেয়।

বললাম,—হ্যাঁ, চল, চল।

ব্যাধিমুক্ত

রসময়কে আমরা যখন দেখি তখন তার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গেছে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল এত ছোট করিয়া ছাঁটা যে মনে হয়, মাথা ন্যাড়া করার পর সদ্য চুল উঠিতেছে। তারি মধ্যে সুপুষ্ট একটি শিখা, পরিপাটি করিয়া বাঁধা। গলায় তুলসীর মালা।

তার বাল্য ইতিহাস একটু পরিশ্রম করিয়াই জানিতে হইয়াছে। চল্লিশ বছর বড় কম দিন তো নয়।

রসময় বৈষ্ণব। অতি শৈশবে বাপ-মাকে হারাইয়া সেই যে চাটুয্যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল, আর বাহির হয় নাই,—হইবার প্রয়োজনও হয় নাই। রসময় ছেলে ধরিত, বাসন মাজিত, তরকারী কুটিত, মসলা পিষিত, জল আনিত এবং প্রয়োজন হইলে বাবা ঠাকুরের তামাকও সাজিত।

বাবা ঠাকুর সদাশিব মানুষ। সকালে-সন্ধ্যায় বাহিরের ঘরে চক্ষু মুদিয়া তানপুরায় গলা সাধিতেন, দুপুরে আহারের পর নিদ্রা দিতেন এবং বিকালে ভাগলপুরী গাইটিকে 'দীঘদড়া' দিয়া সামনের

নিমগাছে বাঁধিয়া একটা মোড়ায় বসিয়া পাট কাটিতেন। দিন রাত্রিকে এমন নিপুণতার সহিত নানা কাজে ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে তাঁর যে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন আছে এমন মনেই হইত না।

বিপদ হইত মাঠাকরুণকে লইয়া। বাবা ঠাকুরের কাছে সুবিধা না পাইয়া বাগ্দেবী বুঝি সম্পূর্ণভাবেই মাঠাকরুণের রসনাগ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ক্ষুদ্রতম দোষ-ত্রুটিও তাঁর চক্ষু এড়াইত না। রসময় শুধু একা নয়, তার ঊর্দ্ধতন এবং অধঃস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ, মাঠাকরুণের কাছে কাহারও নিস্তার ছিল না। তবু কেন যে ওই অবোধ শিশু দিনরাত্রি তাঁরই পায়ে পায়ে ফিরিত তাহা সে-ই জানে।

এমনি সংসারে রসময় পরমানন্দে দিনাতিপাত করিয়া দিনে-দিনে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। খেলার সাথীর অভাব নাই। চাটুয্যের বড় দুইটি ছেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। বধূ দুইটি তাহারই সমবয়সী। তাহাদের সহিত এই আট ন' বছরের ছেলেটি খেলা করিয়া, গান গাহিয়া এবং ছুটাছুটি করিয়া দিন কাটায়, যেন তাহাদেরই সমবয়সী একটি ননদ। ইহার উপর চাটুয্যের সর্ব্বকনিষ্ঠা মেয়েটিও আছে। বয়স তার তিন বছর হইলেও সব খেলাতেই ইহাদের মধ্যে থাকা চাই।

শাশুড়ীর কাছে বকুনি খাইয়া বৌ দুটি রসময়ের কাছে বেদনা জানাইতে আসিত।

রসময় বলিত,—কাঁদিসনে বৌ, মাঠাকরুণের মুখের চোপা একটু বেশী। আমারও ভাই, মাঝে-মাঝে মনে হয়, যে দিকে দু'চোখ যায়, দিই ছুট্।

ছোটার কথায় দুটি বৌ-ই হাসিয়া উঠিত, তুই আবার ছুটবি কি রসো, তুই কি ছুটতে পারিস না কি ?

রসোর পৌরুষে ঘা লাগিত। গম্ভীরভাবে বলিত,—ব্যাটা ছেলে আবার ছুটতে পারে না ? ছুটি না তাই। নইলে এখান থেকে এক ছুটে নুড়িমাধবতলা অবধি যেতে পারি, জানিস ? এ কি তোদের মতো মেয়ে মানুষ !

মেয়ে মানুষ দু'টি কিন্তু তার এত বড় কথাতেও বিশ্বাস করিত না। বলিত,—কই ছোট্ তো দেখি, ছোট বৌএর সঙ্গে।

ছোট বৌএর ছুটিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু ছোট বৌএর আঁট-সাঁট দেহের বাঁধনের দিকে চাহিয়া শীর্ণদেহ রসোই পিছাইয়া যাইত। বলিত,—হ্যাঁ, তাই বই কি ! তার পরে গিরি কাঁদুক, মাঠাকরুণ দেখুক আর আমি বকুনি খাই। তোদের কি ভাই, তোরা বৌ মানুষ, তোদের তো আর কাণমলা খেতে হবে না।

এমনি করিয়া রসময়ের দিন যায়।

তার পরে বধূ দুইটির দেহে কাণায়-কাণায় যৌবনের জোয়ার আসিল। লঘুচ্ছন্দ রসভারে গুরু হইয়া উঠিল। বড় দাদাঠাকুর

ও ছোট দাদাঠাকুর কারণে-অকারণে বাড়ীর মধ্যে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল এবং ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশ পর্য্যন্ত আগাইয়া অকস্মাৎ থামিয়া গেল,—আর আগাইতে চাহিল না। বড় ভাই বাহিরের ঘরে সেতার এবং ছোট ভাই তবলা লইয়া মাতিয়া উঠিল।

ইহার পরেও বাবাঠাকুরের কিন্তু কোনো পরিবর্ত্তনই হইল না। তিনি মনানন্দে তানপুরায় গলা সাধিয়া চলিলেন।

তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন মাঠাকরুণ। গিরির গৌরী-দানের বয়স পার হইয়া গেল, তার একটা সুপাত্র জোটানো চাই। দুটি ছেলেই পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া যে ভাবে সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছে তাতে তাহাদের ভবিষ্যৎও বড় মনোহর নয়।

তাল পড়িল বৌ দুটির উপর।

—না উঠলেই তো চলতো। আমি তো আছিই। একেবারে দুপুর বেলায় ঘুম ভাঙাতাম, দুটি খেয়ে নিয়ে আবার ঘুমুতে।

মাঠাকরুণের কণ্ঠস্বর চিরদিনই একটু চড়া পর্দ্দায়। সুতরাং মুখুয্যেগিন্নি হাতের কাজ ফেলিয়াও একবার আসিতেন।

—কাজ-কর্ম্ম সব হ'ল, দিদি?

—সেই কথাই তো বলছি ভাই, আমি বুড়ো মাগী [illegible] কোন সকালে উঠে খাটবো-খুটবো, আর দুপুর হ'তে চললো তোমাদের ঘুমই ভাঙে না?

দুটি বৌই সিঁড়ির গোড়ায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া তখন দুর্গা-নাম জপিতেছে।

সেদিকে আড় চোখে চাহিয়া মুখুয্যেগিন্নি ফিক্ করিয়া একটু হাসিলেন। হাতের কাজ হাতেই রহিল, তুটি গিন্নি এমন ভাবে আজকালকার বৌদের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন যাহা কাণ দিয়া শোনা যায় না।

ফলে, দেখা যাইতে লাগিল, সকালে, সন্ধ্যায়, যখন একটু ফাঁক পায়, কখনও সিঁড়ির পাশে, কখনও ভাঁড়ার ঘরের কোণে তুটি বৌ জড়াজড়ি করিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া আছে।

কিন্তু এতেও ইহাদের হাসি বন্ধ হয় না। চুপি-চুপি ফিস ফাস হাসাহাসি চলেই।

এই কয় বৎসরে রসো কিন্তু ইঞ্চিখানেকের বেশী বাড়িল না। তবু এই হাসাহাসি তাকে যেন টানে। হাতের কাজ ফেলিয়াও সে ইহাদের কাছে উপস্থিত হয়।

—মর্, অত হাসছিস কেন লো?

হাসি তাতে বাড়িয়াই চলে। রসোর সামনে ইহাদের গত রাত্রের কথা কহিতে বাধে না। সে যে কাছা দিয়া কাপড় পরে সেটা যেন ইহাদের খেয়ালই হয় না।

বছরখানেক মাঠাকরুণে ও বাবাঠাকুরে ধস্তাধ্বস্তির পর একদিন গিরির বিবাহ হইয়া গেল।

এবং আরও বছর তিনেক পরে আগে বাবাঠাকুর এবং পরে মাঠাকুরাণী স্বর্গারোহণ করিলেন।

প্রথম কিছুদিন গিন্নী হইল রসোই।

বড় কড়া গিন্নী,—বাড়ীর ভিতর পুরুষমানুষের প্রবেশ নিষেধ।

কচুওয়ালা দোর গোড়া হইতে উঁকি মারিয়া হয় তো হাঁক দিল, রসো শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল,—ওই বাইরেই নামাও কচু।

তারপর গজগজ করিতে করিতে বলে—মর্, একমুখ দাড়ি নিয়ে মিন্‌ষে একেবারে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে যায়।

মাঝে-মাঝে বৌদের উপরও ঝাল ঝাড়ে;—

—দিনরাত্তির ফিসির্ ফিসির্ কী করিস লো। বিয়ে কি আর কেউ করে না?

বড় বউএর হাসি রোগ,—কেবল হাসে।

রাগে রসোর পিত্ত জ্বলিয়া যায়। বলে,—আহা, কি হাসিই শিখেছিস মাইরি।

ছোট বৌ ওপরের বারান্দার রেলিং হইতে ঝুঁকিয়া বলে,—রসময়ী, উনোনে আগুন দিয়েছ?

রসো ঝাঁঝিয়া বলে,—না, তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে আছি। রান্নাটাও কি আমিই চাপিয়ে দোব?

ছোট বৌ হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া আসে।

বলে,—তা হ'লে তো ভালোই হ'ত। কিন্তু হবার যে জো নেই।

বড় বৌ যোগান দেয়,—আমাদের যে সময় নেই রসো। কুড়ির

কাছে এসে পড়েছি। মেয়াদ ফুরুলো ব'লে। জানি আমাদের রসময়ী আছে, এই ক'টা দিন সেই চালাবে।

রসো খুশী হয় কি না বোঝা যায় না। মুখ ফিরাইয়া আপন মনে কাজ করে।

কখনও বলে,—তোমাদের ভাই, বেশ।

—কেন ? কেন ?

—বাবুই পাখী বাসা বাঁধে না ? তেমনি। দাদাঠাকুরেরা খুঁটে-খুঁটে খড়টি, কুটোটি এনে দিচ্ছে, তোমরা পায়ের ওপর পা দিয়ে বাসা বাঁধছ। হাঙ্গামও নেই, হুজ্জোতও নেই।

—তার ওপরে রসময়ী আছেন। কি বল ?

—রসময়া হ'লেই ভালো হ'ত। রসময়ের ওপর ঘেন্না ধরে গেল।

মাঝে-মাঝে তার পৌরুষ জাগে। কখনও বড় বড় বলদ দুটাকে বাঁধিতে যায়, কিন্তু শিং বাঁকাইয়া ঘাড় নাড়িলেই ছুটিয়া পিছাইয়া আসে।

—কি দস্যি বলদ মা, কাছে গেলেই ফোঁস ! ওদের কি আর বুদ্ধি আছে ? গুঁতিয়ে দিলেই চিত্তি !

কখনও দাদাঠাকুরকে ধমক দিতে যায়। কিন্তু এমন করিয়া হাত নাড়িয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, চোখ ঘুরাইয়া ঝগড়া করে যে দুটি দাদাঠাকুরই হাসিয়া বলে,—আর জ্বালাস্ নে রসো, তুই ভেতরে যা।

রসো এক ঘর লোকের সামনে লজ্জা পাইয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসে। বৌদের কাছে জিভ্ কাটিয়া বলে,—কি লজ্জার কথা ভাই, দাদাঠাকুরের কাছে গেলাম যদি, এমন [illegible] তাড়িয়ে দিলে, আমি যেন মেয়ে মানুষ !

বৌরা হাসে ; বলে,—মেয়ে মানুষই তো। তুমি আমাদের রসময়ী।

রসো লজ্জা পায়, বলে, আহা !

রসোর মাথায় ছিট্ও একটু আছে।

কিন্তু এমন অবস্থাও বেশীদিন চলিল না।

একটি, দুটি, তিনটি করিয়া অনেকগুলি শিশু দুটি বধূর মারফৎ এই পৃথিবীর সূর্য্যোলোকে কলকাকলি তুলিল। এবং ইহাদেরই দুধ লইয়া প্রথমে রসো, পরে প্রতিবেশিনীদের নিকট দুজনেই গোপনে বিবিধ অভিযোগ জানাইতে লাগিল। অবশেষে একদিন দুজনেই সামনা-সামনি এক পশলা হইয়া গেল।

ব্যাপার দেখিয়া দাদাঠাকুর দুজন বাহিরের ঘরে আশ্রয় লইয়াছে এবং অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত ভিতরে আসে না। অধিকন্তু, পালা করিয়া এক একজন এক একবার শিষ্য বাড়ীতে পদধূলি দিয়া অন্ন সংস্থানের চেষ্টায় বাহির হয়। ছোটটি সঙ্গে

সঙ্গে ট্রাম কোম্পানীতে একটা কণ্ডাক্টরী জোটাইবার চেষ্টাও করিতেছে।

কিছুদিন হইতে বড় দাদাঠাকুরের সেতারটির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তারপর আর নূতন তার লাগাইবার প্রয়োজন হয় নাই। সেটি ঝুলির মধ্যে দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে। ছোট দাদাঠাকুরের বাঁয়াটিকেও এমন করিয়া পোকায় কাটিয়াছে যে, তাহাতে হস্তার্পণের উপায় নাই।

বৌ দুটি দোতালার বাসর ভাঙ্গিয়া দিয়া ভোর হইতে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত নীচেই থাকে। একজন দিনে এবং একজন রাত্রে রান্নাঘরের চার্জ্জ লইয়াছে। তার উপর অতগুলা ছেলে মেয়ে লইয়া খাটুনিও তো সোজা নয়।

রসোর গিন্নীপণা শেষ হইল।—আবার যে কে-সেই।

পৃথিবীতে এতবড় একটা বিপর্য্যয় হইয়া গেল, কিন্তু ইহা যেন তাহাকে স্পর্শও করিল না। সে আগের মতই ছেলে ধরিতে, বাসন মাজিতে আরম্ভ করিল এবং মধ্যস্থতা করিতে গিয়া দুটি বৌএর ঝগড়া বাড়াইয়া দিতে লাগিল।

আরও বছর দশেক গেল।

রসো এ পাড়া ও পাড়া মেয়ে মহলে টাকা সুদে খাটাইতে লাগিল। তার খরচ তো কিছু নাই। আর একটা সংসারে

থাকিলে নানাভাবে দু'চার পয়সা হাতে আসেই। তাই জমাইয়া টাকা হয়, সেই টাকা সুদে খাটায়।

সেই সঙ্গে পাড়ায় গুজব রটিতেও দেরী হইল না যে, চাটুয্যেদের সংসারে থাকিয়া রসো বেশ দু'পয়সা করিয়াছে।

এ সংবাদে বড় দাদাঠাকুর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কনিষ্ঠ তাহাকে শান্ত করিয়া একটা ভালো দিন দেখিয়া অকস্মাৎ রসোকে মন্ত্র দিয়া দিল।

ইহার কিছুদিন পরেই বাসন মাজার কাজ হইতে রসো রেহাই পাইল। ছোট দাদাঠাকুর কোথা হইতে একটি আধাবয়সী বিধবা বৈষ্ণবী যোগাড় করিয়া আনিল। নূতন পোর্টফোলিও তাহারই হাতে পড়িল।

ঝি দেখিয়া রসো তো গালে হাত দিল।

—ও ছোট বৌ, ছোট দাদাঠাকুর এ কাকে নিয়ে এসেছেন? একে তুমি রাখবে কোথায়?

ছোট বৌএর মনটা আগে হইতেই খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। সর্-সর্ করিয়া রান্নাঘরে যাইতে যাইতে বলিল,—মাথায়।

ও প্রসঙ্গ সেদিন ওইখানেই চাপা পড়িল। এবং দিন কয়েকের মধ্যে স্বামীর রকম-সকম দেখিয়া সম্পূর্ণ না হইলেও তাহার মন অনেকটা হালকা হইয়া গেল।

এমন সময় রসো একদিন চক্ষু স্থির করিয়া ছোট বৌএর শোবার ঘরে হাঁফাইতে-হাঁফাইতে উপস্থিত হইল।